বিধ্বস্ত
মানবতা
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

বিধ্বস্ত মানবতা

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

সংকলনে

মুজাহিম

মুহাম্মদ ব্রাদার্স

৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বিধ্বস্ত মানবতা
মূলঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)
অনুবাদঃ আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

প্রকাশনায় : **মুহাম্মদ ব্রাদার্স**
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী '২০১০ইং

প্রচ্ছদ : সালসাবিল

অক্ষর সংযোজনঃ **মারজিয়া কম্পিউটার্স**
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণে : **তাওয়াক্কুল প্রেস**
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

ISBN: 984-622-019-7

মূল্য : ১৬০.০০ (একশত ষাট) টাকা মাত্র।

Biddhasta Manobata: Demolished Humanity: Lectures delivered by the Sayed Abul Hasan Ali Nadvi, compliled by Muzahim. Published by Muhammad Brothers, 38, Bangla Bazar, Dhaka-1100, Bangladesh. Printed by M/s Tawakkul Press, 66/1, Naya Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh.

উৎসর্গ

যাঁরা শত কষ্ট করেও আমাকে বড়
করে তুলেছেন সেই স্নেহময়ী
মা ও স্নেহময় আব্বাকে
এবং
মেজ মামা ও বড় ভাইকে
যাঁদের স্নেহ ও ভালবাসা আমার
বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগায়।

আমাদের কথা

রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে লাখো শোকর আর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি অশেষ দরূদ ও সালাম। আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)-কে বিদগ্ধ পাঠক সমাজে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই। স্ব-পরিচয়ে তিনি বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মুসলিমের নিকট সুপরিচিত। ক্ষণজন্মা এই মহান পুরুষ বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই ইসলামের পয়গাম নিয়ে সফর করেছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সকল দেশেই তাঁর ছিল দাওয়াতী পদচারণা। এদিক থেকে তাঁকে দ্বিতীয় বতুতা (বাত্‌তুতা) বললেও অত্যুক্তি হবে না। আল্লামা নদভী দেশ ভ্রমণ ও ইতিহাস অধ্যয়নের আলোকে যে সারগর্ভ বক্তৃতা ও আলোচনা রেখেছেন, সে সকল বক্তৃতা ও প্রবন্ধে মানবতার প্রতি আল্লামা নদভী (র.)-র গভীর ভালবাসা, বেদনার ছাপ সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

আমরা প্রত্যক্ষদর্শী ও তাঁর এদেশীয় ছাত্রদের মুখে শুনেছি, পৃথিবীর কোথাও মুসলমানদের ওপর অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম হতে শুনলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন, সারা রাত ঘুমাতে পারতেন না। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তার কিছুটা প্রমাণ বহন করে।

আল্লামা নদভী (র.)-র প্রবন্ধমালা এমন এক নাযুক মুহূর্তে **'বিধ্বস্ত মানবতা'** নামে প্রকাশ পেতে যাচ্ছে যখন সত্যিকার অর্থেই বিশ্বে মানবতা চরমভাবে ভূলুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত। মানবতার এ চরম লাঞ্ছনার সময়ে একটি বই প্রকাশ করার তাগিদ অনুভবে রাব্বুল আলামীনের কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আর এগুলো সংকলন করে দেয়ার জন্য জনাব মুজাহিম সাহেবকে আমরা আন্তরিক মুবারকবাদ জানাই। সেই সাথে শত ব্যস্ততার মাঝেও সম্পাদনার দায়িত্ব নেয়ার জন্য জনাব ফজলুল কাদির সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞ। আল্লাহ্ তাঁকে উত্তম জাযা দান করুন! আমাদের এ প্রয়াস সফল হলে নিজেদেরকে ধন্য মনে করব।

পরিশেষে আল্লাহ তা'আলা আমাদের চেষ্টা-সাধনাকে কবূল করুন! আমীন!

এপ্রিল/২০০৩ ইং, ঢাকা।

-প্রকাশক

দু'টি কথা

এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই, খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী ছিল মানব ইতিহাসের সর্বাধিক অন্ধকারময় ও অধঃপতনের যুগ। বছরের পর বছর ধরে মানবতা অধঃপতন ও অবনতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এ সময় সে তার চূড়ান্ত সীমায় গিয়ে উপনীত হয়েছিল। গোটা দুনিয়ার এমন কোন শক্তি ছিল না যা এই পতনোন্মুখ মানবতাকে হাত ধরে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। এমন সময়ই নবুয়তে মুহাম্মদীর আগমন যে সময় মানবতা নিভৃতে ধুঁকে ধুঁকে মরছিল, অবস্থা যেন এমন দাঁড়িয়েছিল মানুষরূপী জংলী জানোয়ারেরা অসহায় দুর্বল মানব জাতির খোদা বনে বসেছিল। তারা যেভাবে চাইত ঠিক সেভাবে তাদের জীবন চলত। প্রতিবাদ করার কোন অবস্থাই ছিল না।

সে সময় এমন একজনকেও খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিল, যিনি মানবতার জন্য সামান্যতম কাঁদবেন। এমন এক অবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীর হাল ধরেন। সে সময় মুহাম্মদ (সা.) মানবতার হাল না ধরতেন তবে আমাদের এ পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেত। পৃথিবীতে যত উন্নতি, অগ্রগতি তার সবই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহান অবদান।

পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম অবশিষ্ট ছিল না যা মানবতাকে সুষ্ঠ সমাধান দিতে পারত। ইসলামই একমাত্র বিশ্বজনীন শাশ্বত ধর্ম ও জীবন দর্শন যা অবস্থা, পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশের প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত সকল সমস্যার নিখুঁত ও সুন্দর সমাধান দিতে পারে।

আজ বিশ্বব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছে তা তাতারী হামলা থেকে কোন অংশে কম নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তা তাতারী হামলাকেও হার মানায়। তারা এমন কোন অস্ত্র ব্যবহার করেনি যার অভিশাপের ধারা আজো বহমান। আর আজ অধুনা বিশ্বে মানবতার নামে যে হারে মানব নিধন চলছে তার কোন নজীর জাহিলী সমাজেও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। পৃথিবী আজও ভুলে যায়নি জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমার কথা।

বিজ্ঞানের অপব্যবহারে মানবতা আজ ধ্বংস হতে চলেছে। বিজ্ঞান মানবতাকে অনেক কিছুই দিয়েছে। কিন্তু সে তার উদ্ভাবিত জিনিসের কল্যাণকর কিছুই শিক্ষা দিতে পারেনি, পারেনি সে মানুষকে মানবতার সবক দিতে। যদি বিজ্ঞানপ্রেমীদের প্রশ্ন করা হয় ঃ অসহায় আফগান নারী ও শিশুদের ওপর জুলুম কী কারণে হলো, হিরোশিমাতে আজও কোন সুস্থ শিশুর জন্ম হয় না কেন? হারজেগোভেনিয়াদের কী দোষ ছিল, অন্যদিকে একই গর্তে কিভাবে হাজারো লাশের দাফন করা হচ্ছে? ফিলিস্তিনী বা কাশ্মিরীরা–তাদেরই বা কী দোষ? সদ্য ঘটে যাওয়া গুজরাট ও ইরাকীদের অবস্থাটাই চিন্তা করুন! কী উত্তর আছে এসবের বিজ্ঞানীদের কাছে?

আমরা সমাজের মূল স্রোতধারার শক্তির কথা বেমালুম ভুলে যাই যেসব মানবহিতৈষীগণ তাঁদের মেধা, দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাদের এ কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে দান করেছেন এক সুষ্ঠ অবকাঠামো। মানবতার উত্তরণ ঘটিয়ে একে অপরকে সম্প্রীতির ডোরে আবদ্ধ করেছেন। আজ তাঁরা এ সভ্যতার ইতিহাসে স্থান করে নিতে পারেন নি। পক্ষান্তরে ইতিহাসের পাতাগুলো ভরে আছে শয়তানের চিত্র ও মানবতা ধ্বংসকারীদের নিষ্ঠুর বানোয়াট কাহিনীতে।

আপনি পাশ্চাত্যের চরিত্রগত দুরবস্থা দেখলে বলতে বাধ্য হবেন, ওরা আজ অধঃপতনের শেষ ধাপে পৌঁছে গেছে। একদিকে ওরা যেমন চাঁদের দেশে ঘুরে ফিরছে, তেমনিভাবে নৈতিক অবক্ষয়ে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে অসভ্য জানোয়ারে পরিণত হচ্ছে। আমেরিকা জাগতিক জীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে কিন্তু যুবক শ্রেণীকে দিতে পারেনি চরিত্র গঠনের কোন মহৌষধ। সে আজ জংলী হাতীর ন্যায় মানবতাকে অসহায় এক কংকালে পরিণত করেছে। তার নিকট নেই কোন মানবতার শিক্ষা বা মূল্য।

মানুষ আজ অনেকটা সচেতন হয়ে উঠেছে। দেশের রাজাধিরাজরা আজ দিশেহারা, গুণীজনদের সংস্পর্শে এসে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চায়। মানবতার এই বিপর্যয় দেখে যে সব মনীষী ও চিন্তাবিদ তাঁদের ক্ষুরধার লেখনী, কলমি জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হলেন উপমহাদেশের যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, বুযুর্গ ও দার্শনিক আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর।

আল্লামা নদভী মানবতার দাওয়াত নিয়ে বিশ্বের প্রায় সকল দেশই সফর করেছেন। তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য যেখানেই গেছেন সেখানেই মানবতার দাওয়াত দিয়েছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আল্লামা নদভী (র.) বিভিন্ন দেশে প্রদত্ত বক্তৃতামালার বাংলার সংকলন। বিশ্বে বিভিন্ন প্রান্তে আজ যখন চরমভাবে মানবতা লুণ্ঠিত তেমনি এক মুহূর্তে 'বিধ্বস্ত মানবতা' নামক বইটির অনুবাদ সংকলন করতে পেরে আল্লাহর দরবারে শোকর আদায় করছি। এ কাজে যাঁরা আমার সহযোগিতা করেছেন তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ, বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় বড় ভাই জনাব ফজলুল কাদির সাহেবের নিকট তিনি সম্পাদনার দায়িত্বটা না নিলে এর প্রকাশ সময়মত কখনই সম্ভব হতো না। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মুহাম্মদ ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী জনাব মুহাম্মদ আবদুর রউফ সাহেবের নিকট যিনি আল্লামা নদভী (র.)-র বইগুলো প্রকাশনার ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এ নেক উদ্দেশ্য সফল করুন এবং বইটিকে আমাদের সকলের নাযাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন!

মুজাহিম

তাং-২২/০৩/০৩ ইং — মনোহরপুর।

সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

ইসলামের ছোঁয়া পেলে আমেরিকার ইতিহাস অন্য রকম হতো

[হার্ভার্ড ভার্সিটি-১৯৭৭ সালের ৬ই জুন। এখানে আল্লামা নদভী নিম্নোক্ত বক্তব্য রাখেন। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনৈক বেলালী মুসলমান।]

আমেরিকার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ -

-"নিশ্চয় আমি মানুষকে সুন্দর গঠন অবয়বে সৃষ্টি করেছি।"

সুধী শ্রোতামণ্ডলি!

আজকের বক্তব্যের ভূমিকা টানছি এমন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে, যার দিক নির্দেশনা উক্ত আয়াতের মাঝে পাওয়া যায়। আজ এমন কথা বলতে যাচ্ছি, যা অনেকের কাছে বেমানান মনে হবে। পাশ্চাত্য বলতে আজ আমেরিকা ও ইউরোপের দেশসমূহকে বোঝায়। ইউরোপ-আমেরিকা একদিকে সৌভাগ্যশীল রাষ্ট্র, অপরদিকে দুর্ভাগ্যশীলও। একটি বাক্যের মধ্যে এ ধরনের বৈপরীত্য দেখে এ শুনে হয়তো বিস্মিত হবেন আপনারা। এর মধ্যেই উক্ত বৈপরীত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।। এ আয়াতের মর্ম এ রাষ্ট্রের সাথেই বোধ করি সবচেয়ে বেশী খাপ খাবে। এ সেই আমেরিকা, গোটা বিশ্বের মোড়লীপনার চাবি যার হাতের মুঠোয়। এ নিয়ে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' শীর্ষক দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

প্রশ্ন জাগে, গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা এরা কি করে অর্জন করল? তামাম দুনিয়ার মানুষের জীবন কাল এদের ওপর কিভাবে নির্ভরশীল? নিশ্চয় এদের এমন কোন স্বভাবজাত গুণ আছে, যদ্দরুন সকলে আমেরিকার তল্পীবাহক সেজেছে। সারা জাহান যখন তাদের ভজন গীত গাইছে, তখন এদেশকে দুর্ভাগ্যশীল বলে বোকামী করলাম না তো? সত্যি বলতে কি, দুর্ভাগ্য হওয়ার প্রতিক্রিয়া কেবল ওদের মাঝে সীমিত থাকলে আমার বলার কিছু ছিল না। হতো না এ বক্তব্য তেমন একটা যুৎসই। কিন্তু সামনের আলো যেদিকে যায়, সেদিকে যায় পেছনের আলোও। তাই আমেরিকার দুর্ভাগ্য মানে সারা জাহানের দুর্ভাগ্য। আবহমান কালের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখতে পাবেন, মাথা খাটিয়ে যারা একদিন নতুন নতুন আবিষ্কার করে সকলকে হতবাক করে দিয়েছিল, তারাই একদিন পতনের চোরাবালিতে ডুবে গিয়েছিল।

মনে রাখবেন, আমি শুধু এক বাক্যের মধ্যে ঐ বৈপরীত্যের নামোচ্চারণ করছি না এবং এক শ্বাসে-ই উচ্চারণ করছি, আমেরিকা! তুমি দুর্ভাগ্যশীল রাষ্ট্র। তুমি নিঃস্ব, আবার তুমি সৌভাগ্যশীলও।

আমেরিকার সৌভাগ্যশীল দিকগুলো হচ্ছেঃ এদেশকে আল্লাহ্ তা'আলার তাঁর অনুদান দিয়ে ভরপুর করে দিয়েছেন। তিনি এখানকার লোকদের শক্তি, কর্মস্পৃহা, মেধা ও বিবেকের প্রাচুর্য দান করেছেন। এরা আমেরিকাকে স্বর্গরাজ্য বানিয়েছে! অধুনা বিশ্বের দাম্ভিক শাসকবর্গও ওদের সামনে মাথা নত করে থাকে। ইকবালের ভাষায় সৌর রশ্মিকে এরা কব্জা করেছে। তারকাদের কক্ষপথের ওপর গভীর নজর রাখছে। এ দেশের মাটিকে সোনার চেয়েও দামী করেছে। এ জমিনে আজ সোনা ফলছে। ইথারে-পাথারে সৌভাগ্যের ঈগল পাখা মেলেছে। এদেশে (বাইবেলের ভাষায়) দুধ ও মধুর নদী বয়ে চলে। এগুলো আমেরিকানদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর, প্রতিযোগিতার ফসল, কর্মকুশলতার প্রাপ্তি। হার-না-মানা শক্তির পরম পাওয়া। গোটা আমেরিকা-ইউরোপে খোদায়ী অনুদান জালের মত বিছানো। প্রকৃতি অকৃপণ হস্তে ঢেলে দিয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদ, এমন কি জনতার সংখ্যাধিক্যের বেলায়ও আমেরিকা পিছিয়ে নেই। অঢেল সম্পদ ভোগ করার মত জনতা এদেশে আছে। সৌভাগ্যের সোনার ঈগল কেবল আমেরিকানদের স্বপ্নের নীড়ে ধরা দেয়নি, বরং এর উসিলায় ধরা দিয়েছে গোটা বিশ্বের সুখের রাজ্য। আজকের বিশ্ব কোন না কোনভাবে আমেরিকার দরজায় ধরনা দিয়ে থাকে। দরিদ্র বিশ্ব আজ ওদের দরজায় ভিক্ষার ঝুলি পেতে থাকে। অপূর্ব সুশৃঙ্খল বলে ওরা আপনার দেশকে গুছিয়ে ফেলেছে। এসব দৃষ্টিকোণে ওরা সৌভাগ্যশীল জাতি। মধ্যপ্রাচ্য কিংবা অন্য কোন দেশে বসে এ কথা বললে হয়ত উক্ত সংকেতগুলো খুলে বলতে হতো, কিন্তু আমি, আপনি, সকলেই সৌভাগ্যের সেই আহা মরি দেশে আছি! সুতরাং ভেঙে খুলে বলার দরকার নেই

সৌভাগ্যের দোহাই পেড়ে আপনি যত সংকেতই তুলে ধরবেন তার সবটাই অভিপ্রেত ও যথার্থ। বিন্দুবিসর্গও মিথ্যা নয়। এক্ষণে বলে রাখা ভাল, আমি উগ্রতা, কট্টরতা, ধর্মান্ধতা, এশীয় জাতীয়তা কিংবা আঞ্চলিক বিদ্বেষ এগুলো বলছি না, বরং যা সত্য ও বাস্তবিক কেবল তা-ই বলছি।

এতদ্‌সত্ত্বেও আমেরিকা দুর্ভাগ্যশীল রাজ্য। আমি দ্বিধাহীন চিত্তে উচ্চারণ করছি। কেউ এটাকে আজগুবি, গাঁজাখুরি বললেও বলতে পারেন। কিন্তু সত্যের হৃদয়গ্রাহী পর্দায় মিথ্যার প্রলাপ অংকন অনর্থক। ইতিহাস কালের সাক্ষী, যা বলছি, তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়। এর আপাদমস্তক সত্য অনস্বীকার্য।

সৌর রশ্মি যাদের করায়ত্ত

এটা শুধু এ দেশটির ব্যর্থতা নয়, বরং এটা গোটা মানব জাতির ব্যর্থতা। ব্যর্থতা মানবতার। বস্তুগত উৎকর্ষে এদেশের জুড়ি নেই। টেকনোলজির অগ্রগতিতে এরা রেকর্ড করেছে। হায়! এদেশটি যদি সঠিক দিশা পেত! পেত

দ্বীন ইসলামের ছোঁয়া! তাহলে ইতিহাস অন্য রকম হতো। বস্তুবাদের পেছনে এরা যেমন মেহনত করছে, তেমন করছে না চরিত্র গঠনের জন্য। যে হারে মহাশূন্যে ওরা কুদরতের অফুরন্ত নেয়ামত পর্যবেক্ষণ করছে এবং

سنريهم اياتنا فى الافاق -

"আমি আসমানে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব" এর ওপর আমল করছে, যে হারে ওরা আল্লাহ্ তা'আলা অপার দানকে অনুভূতিগ্রাহ্য করছে, সে হারে যদি আল্লাহ্ তা'আলা নিদর্শনাবলী জনসমাজে প্রচার করত। আল্লাহর নেয়ামতগুলোকে আত্মকেন্দ্রিক না করে তার নিগূঢ় তত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত মর্ম জনসম্মুখে তুলে ধরত, তাহলে যে কত ভাল হতো! ওদের দূরবীন লাগানো চোখ যে হারে নিত্য-নৈমিত্তিক মহাশূন্যের অজানা রহস্য উন্মোচনে ঘুরে ফেরে, চাঁদের বুকে পা আঁকে দেয়ার জন্য যে শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে, সে হারে যদি ওরা আবিষ্কার করত মানুষের জন্য রহস্য, খবর নিত আধ্যাত্মিক জগতের, তাহলে মানবতার সন্ধান পেত। মানুষের আর্থিক উন্নতি, শক্তি-সামর্থ্য, ভালবাসা-সৌহার্দ্য ও কলুষমুক্ত [illegible] জগতে ওরা যদি একটু দৃষ্টি দিত, তাহলে ওদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জাতি এ জগতে অন্য কেউ হতো কি-না সন্দেহ। জড়বাদের পেছনে ওদের গবেষণা। হায়! ওরা যদি আত্মার গভীরতা জানত! সারা দুনিয়াকে দলামোচা করে যদি আত্মার মাঝে ঢোকানো হতো, তাহলে মৃত সাগরে নিক্ষিপ্ত একটি পাথর (Concrete) যেভাবে হারিয়ে যায়, সেভাবে ওরা আধ্যাত্মিক চিন্তায় ডুবে যেত। মর্যাদা নিয়ে ভাবার সময় পায় না ওরা, পায় উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণী নিয়ে ভাবার সময়। রসায়ন, গণিত আর জীববিদ্যা (Chemistry Mathematics and Biology) নিয়ে ওদের গবেষণার অন্ত নেই। জড়বাদী হবার দরুন আজ ওদের এই করুণ পরিণতি!

আল্লাহতা'আলা বলেন ঃ

ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى -

'মানুষ যা পেতে শ্রম ব্যয় করে তা–ই পায়। তার চেষ্টা-কোশেশ দেখে পুরোপুরি বদলা দেয়া হয়।'

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

'আমি তাদেরকে ও তাদের সকলকে আপনার প্রভুর নেয়ামত ভরপুর করে দিয়েছি। আর আপনার প্রভুর নেয়ামত কারো জন্য বাধাগ্রস্ত নয়।'

মানুষ তার নিজস্ব শ্রমবলে যে ময়দানেই অগ্রসর হবে–আল্লাহ্ তাকে সফলতা দান করবেন। এখানে কোন রেশনিং পদ্ধতি নেই। নেই কোন ভাতা ব্যবস্থা। এখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। আমেরিকানরা একথা খুব

ভালো করেই জানে। আফসোস! ওদের শ্রম ছিল রসায়নের ওপর, চিকিৎসাবিদ্যার ওপর, উদ্ভিদ উন্নয়ন-অগ্রগতির ওপর। কিন্তু এসবের প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল গীর্জা। বিজ্ঞানীদের ওপর গীর্জা চরম জুলুম করেছিল। দিয়েছিল দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, অথচ যুগের চাহিদা ও কালের দাবী হচ্ছে, যে যত পার, নিত্য নতুন আবিষ্কার কর। মানবতাকে গীর্জা চরম জুলুম করেছিল। গীর্জাওয়ালারা জানত না মানবতাকে কি করে মূল্যায়ন করতে হয়। আহ! ওরা যদি মানবতার আকাশ ছোঁয়া মর্যাদার কথা জেনে তাকে মূল্যায়ন করত, তাহলে দুনিয়ার ভাগ্য আরো পূর্বেই ব্যাপক পরিবর্তিত হতো। ঐতিহাসিকরা লিখতেন অন্য ধারায় ইতিহাস।

যুগোপযোগী ধর্ম

বিশ্বে এমন দু'টি ঘটনা সূচিত হয়েছে, যদ্দ্বারা ওরা অসংখ্য নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ঘটনা দু'টি হজ্ব ও খ্রীস্টবাদ। এ দু'টি জিনিষ ওদেরকে এমন এক অপ্রত্যাশিত ক্ষতির সম্মুখীন করেছে, যাতে শুধু আমেরিকা-ইউরোপ নয়, বরং গোটা বিশ্বে তার অশুভ পরিণাম রেখাপাত করেছে। এ ভূ-খণ্ডে খ্রীস্টবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এতে মুসলমানরা কমবেশী দায়ী। এ ব্যাপারে যত মাতমই করা হোক না কেন, সবই তাদের কৃতকর্মের ফল। এখানকার বাস্তবোচিত ধর্ম ইসলাম, যা সচেতন মানবতার অলস নিদ্রা ভেঙ্গে দিতে পারত। শক্তি-সামর্থ্য যোগাতে পারত, ওদের স্বাভাবিক বিবেক চালনার পথে দিতে পারত ইজ্জত-আবরুর নিশ্চয়তা।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ -

'আমি মানুষকে অতি উত্তম গঠন অবয়বে করেছি।'

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

و لقد كرمنا بنى ادم و حملنا هم فى البروالبحر -

'আমি মানব জাতিকে পদ-মর্যাদা দিয়েছি, আসমান-জমিনের শক্তির অধিকারী করেছি। দান করেছি অসংখ্য নেয়ামত। তামাম সৃষ্টি জীবের ওপর তাকে প্রাধান্য দিয়েছি।'

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

انى جاعل فى الارض خليفة -

'মানব জাতিকে জমিনের খেলাফত প্রদান করব।'

ইসলামের বুনিয়াদ হচ্ছে তৌহীদ। কুরআন বলে, মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। তিনি মানুষকে মর্যাদার সুউচ্চ আসনে আসীন করেছেন। হাদীসে কুদসীর দিকে তাকালে মানবতার মর্যাদার মাত্রা সহজে অনুধাবন করা যায় ঃ

'আল্লাহতা'আলা মানব জাতিকে লক্ষ্য করে কিয়ামতের দিন বলবেন ঃ

আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম, তুমি আমার সেবা করোনি।

আল্লাহ্! আপনি রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন? আপনি না এর থেকে পুত-পবিত্র!

আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত ছিল, তুমি তাকে সেবা করলে সেখানে আমায় পেতে।

বান্দারে! আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম। তুমি আমার অন্ন জোগাওনি।

ক্ষুধার্ত ছিলেন আপনি? আপনার সাথে ক্ষুধার কি সম্পর্ক?

আমার অমুক বান্দা ক্ষুধার্ত ছিল। তাকে খাদ্য দিলে আমায় পেতে সেখানে।

বান্দারে! আমি বস্ত্রহীন ছিলাম, তুমি বস্ত্রের ব্যবস্থা করোনি।

আপনি এ কি বলছেন?

আমার অমুক বান্দা বিবস্ত্র ছিল, তাকে কাপড় দিলে প্রকারান্তরে তো আমাকেই দেয়া হতো।'

মানব জাতিকে এর চেয়ে সম্মান আর কি দেয়া যেতে পারে? আরেকটু অগ্রসর হলে দেখতে পাই, মানুষকে তিনি জন্মগতভাবে নিষ্পাপ ঘোষণা করেছেন। হাদীসে এসেছে ঃ

كل مـولود يولد على الفطرة فـابواه يـهـودانـه و ينصرانه و يـمجسانـه -

'শিশু সন্তান নিষ্পাপ হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। পিতা-মাতা তাকে ইহুদী, নাসারা ও খ্রীস্টান বানায়।

মানুষ আল্লাহর রঙ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। মানবের মূল উপাদান হচ্ছে সৎ হওয়া। তার চরিত্র অত্যন্ত নির্মল, এই চরিত্রে কোন বক্রতা নেই।

ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ -

'সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার ওপর বর্তায় যা সে করে।'

অর্থাৎ নেক কাজ করার জন্য কোন প্রকার কৃত্রিমতার দরকার হয় না। 'লাহা মা কাছাবাত' হচ্ছে 'মুজাররদ' 'অক্ষর কম'। কিন্তু 'মাকতাছাবাত'-এর মধ্যে অক্ষর বেশী। শেষোক্ত শব্দটির মধ্যে 'কৃত্রিমতা'র কথাটি উহ্য আছে। সুতরাং মানুষ যে নেক কাজ করে তা আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য করে। আর এটাই তার স্বভাবজাত প্রবৃত্তির চাহিদা। পক্ষান্তরে সে যে বদ কাজ করে ওটা প্রকৃতিবহির্ভূত কাজ। এজন্য তাকে স্বভাবের সাথে সংগ্রাম করতে হয়। একজন যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় যা সুন্দর, যা চিরন্তন তা-ই চায় মানুষের প্রবৃত্তি। এর বিরোধিতা করা আত্মাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর শামিল। অতএব, এই রাষ্ট্রের সঠিক যুৎসই ধর্ম হিসেবে ইসলাম ছিল অবধারিত। পূর্বেই বলেছি, এ রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের মিলন হলে পৃথিবীর ইতিহাস অন্যরকম হতো। একদিকে এদেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন, ধন-দৌলতের প্রাচুর্য যা বাঁধভাঙ্গা বন্যার ন্যায় স্ফীত হয়ে উঠছে। তাদের কর্ম নৈপুণ্য, অপরাজেয় গবেষণা ও অধ্যবসায়, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে বিচরণের চিন্তা-ভাবনা, সমুদ্রের তলদেশ থেকে মুক্তা আহরণের অভিযান, সৌর রশ্মি কব্জা করার কৃতিত্ব, মাটি থেকে সোনা ফলানো, জড় পদার্থকে সঞ্চালন করে জীবন দানের উপযোগিতা দান সত্যিই বিস্ময়কর ও অবিস্মরণীয়! এতদ্সত্ত্বেও ওদের কালজয়ী বিলাসিতা, শস্য-শ্যামল কুদরতী নেয়ামত, আত্মনির্ভরশীলতা, পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন সবাইকে হতবাক করে দিয়েছে। ওরা সত্য সুন্দর ইসলামকে গ্রহণ করলে মনের কালিমা দূর হতো। তওবা কোন বাধ্যগত জিনিষ নয়, বরং মনের চাহিদা কেবল এটিই। তওবার পরিচয় হচ্ছে বাহ্য ও অভ্যন্তরের সাথে মিল না থাকা। অতএব, আত্মাকে বাহ্যাবয়বের সাথে মিল না করা। তওবাকারীদের মাহাত্ম্য কুরআন-হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলাম মানুষের কামোদ্দীপনা ও শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক। এখানে ভাববাদের কোন অবকাশ নেই। ইসলাম বাস্তববাদে বিশ্বাসী। ইসলাম সুস্পষ্ট প্রাঞ্জল ধর্ম। জ্ঞানী মাত্রই একে সহজে মেনে নিতে পারেন। এ ধর্ম বৈরাগ্যবাদে বিশ্বাসী নয়। মানুষকে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে বন্দী করে না, বরং মানব জীবনকে সুপরিসর একটি সুপরিমণ্ডলে নিয়ন্ত্রণে রেখে জীবন যাপন করতে বলে। এখানে তথাকথিত স্বাধীনতা কিংবা বল্গাহীনতার কোন অবকাশ নেই। ইসলাম জ্ঞান অন্বেষণে বাধা দেয়নি কোনদিনও, বরং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছে—জ্ঞান চর্চা একটি ইবাদত। এ ধর্ম মর্যাদা, গবেষণা, চিন্তা ও প্রজ্ঞা অর্জনে জোর তাগিদ দিয়ে আসছে।

আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করছেন ঃ

وفى انفسكم افلا تبصرون -

'তোমাদের নফসের মধ্যে বহু নিদর্শনাবলী রয়েছে, তোমরা কি তা দেখতে পাও না ?'

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

ويتفكرون فى خلق السموت والارض -

"যারা আসমান-যমীনে সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে (তারা বলে), প্রভু, তুমি এগুলোকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি!"

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

سنريهم اياتنا فى الافاق -

"আমি (পৃথিবীর) দিকে, এমন কি তাদের সত্তার মধ্যে নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব!"

এ ধর্ম মানুষের বিবেক এস্তেমালে জোর দেয়। চিন্তা জগতকে নিস্তেজ আর বিবেক-বুদ্ধিকে অসার ও অকেজো করাকে নিন্দা করে। এ ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা কত সুমহান ঃ

والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها -

"আর তাদেরকে যখন প্রভুর কথাবার্তা বুঝিয়ে দেয়া হয় তখন তারা বোবা ও অন্ধ হয়ে থাকে না (এবং তারা চিন্তা-ভাবনা করে না)।"

অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, আজ শুধু আমেরিকার বিপর্যয় নয়, বরং গোটা মানব জাতির বিপর্যয়। যে ধর্ম মানুষকে পাপাচারীর আকীদা দেয়, মানুষের মাঝে নিরাশার জন্ম দেয়, সে ধর্মমতাদর্শীদের পরিণতি এর চেয়ে আর কিইবা আশা করা যায়! খ্রীস্টবাদ শিক্ষা দেয় ঃ গোনাহ্ একটা তাকদীরগত ব্যাপার, একটা কিসমত। আর কিসমত বদলাবার নয়। সুতরাং খ্রীস্টানদের জন্ম হতাশার। জন্ম পাপাচারীর : অবশ্য মানুষের ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে বোঝাতে হবে, তোমার ভুল হয়েছে, তাই তা শুধরে নাও। এ ভুল তোমার জন্মগত, এতে তোমার হাত নেই। এ ধরনের গাজাখুরি শিক্ষা পেলে ওরা যে কত বড় ধকল পায়, তা বোধ করি খুলে বলতে হবে না।

সারকথা হচ্ছে, খ্রীস্টবাদ-ই এদেশকে দুর্ভাগা বানিয়েছে। এ ধর্ম মানুষকে গলা টিপে মারতে শিক্ষা দেয়। মানুষের পূত-পবিত্র জীবনের ওপর খামাকাই গোনাহর কালো দাগ এঁকে দেয়। পরিণত করে তাদের দোষী হিসেবে। করে দেয় তাদের পশ্চাৎমুখী। তাই অনেকে ক্রমান্বয়ে সংসার সমরাঙ্গন ছেড়ে বৈরাগ্যবাদী হয়। হয় দুনিয়াত্যাগী।

গির্জা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে অন্তরায়

দ্বিতীয় দুর্ভাগ্য হচ্ছে, এক সময় গীর্জা কর্তৃক রাষ্ট্র শাসন চলত। গীর্জা তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে অন্তরায় হয়েছিল। এক সময় অন্ধকার ইউরোপের ঘোর কাটতে লাগল। এক সময় ওদের মধ্যে এল বিজ্ঞানের জাগরণ। একে একে ওরা ছাড়াতে লাগল শৃঙ্খলাবদ্ধ হাত-পা। গীর্জা এতে প্রমাদ গুণল। আগ পাছ না ভেবে গীর্জা ওদের মাঝে বাধার দেয়াল হয়ে দাঁড়াল। প্রতিটি কাজে গীর্জাওয়ালারা ধর্মের দোহাই পাড়তে লাগল। কথায় কথায় পেশ করতে লাগল বিকৃত বাইবেলের সূত্র (Refernce)। বিজ্ঞানীরা যখন ভূ-স্তর নিয়ে গবেষণা করতে লাগল, গীর্জা তখন বাধা দিতে এগিয়ে এল। বিজ্ঞানীরা তাদের দাবীকে সমর্থনপুষ্ট করতে গিয়ে বলল ঃ জগৎ একটি নয়–এ ধরনের আরো জগৎ আছে। গীর্জা তখন ওদেরকে কাফের বলে ফতোয়া দিল। বলল ঃ ওরা মুরতাদ হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা যখন বলল ঃ পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। সঙ্গে সঙ্গে গীর্জার মুফতীরা ফতোয়া ছুঁড়ে মারল। ফতোয়া আর অপপ্রচার করে বিজ্ঞানীরা নিবারণ করতে না পেরে গীর্জা বিজ্ঞানীদের তালিকা প্রণয়ন করল। শুরু হলো ধর্ম আর বিজ্ঞানের চিরন্তন লড়াই। ইউরোপবাসী গীর্জার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ধর্মকে বিদায় জানাল। ধরল জড়বাদ ও বস্তুবাদকে। গীর্জার সংহার মূর্তি দেখে ওদের মনে এটা ঘৃণার উদ্রেক হলো। ওরা সংকল্পবদ্ধ হলো, ধর্মমুক্ত পৃথিবী গড়তে না পারলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব নয়। সুতরাং ধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে হবে। মুক্তি পেতে হবে ধর্মান্ধ গীর্জার মরণ ছোবল হতে। সেদিন থেকে ওরা গীর্জাবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করতে লাগল। তারপর হলো জড়বাদের গোলাম। আজকের এই প্রযুক্তির বিকাশ কেবল সেজন্যেই সম্ভবপর হয়েছে।

সুধীমণ্ডলি! এ উপাখ্যান সুদীর্ঘ ও অত্যন্ত বেদনাদায়ক। অন্তরের জগদ্দল পাথর চাপানোর কাহিনী শোনা যেমন কষ্টকর, তেমনি কষ্টকর শোনানোতেও। ইতিহাস আপনাদের সামনে। আপনারা ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক অবগত। আপনারা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। আপনারা ইতিহাসের গভীর জ্ঞান রাখেন। ছাত্র-শিক্ষক-স্কলার বহু সুধীজন এখানে আছেন। আমি দু' চারটি বাক্য এমন এক ভার্সিটিতে রাখছি যার খ্যাতি জগৎময়। তাই সব কথা খুলে বলতে চাচ্ছি না।

পাশ্চাত্য কৃষ্টির প্রতিফলন

পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতা আজ সাফল্যের স্বর্ণশিখরে উপনীত। সৃষ্টি রহস্যের গভীর জ্ঞান ও অজানা তথ্য সম্পর্কে কেবল সৃষ্টিকর্তাই সবজান্তা ছিলেন, আমরা কিছুই জানতাম না। জানার দাবীটুকু করার নসীবও আমাদের হয়নি। কিন্তু আধুনিক সভ্যতার আশীর্বাদে পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়ায় আমরা সে সব অজানা দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করতে পারছি। পাশ্চাত্য কৃষ্টির প্রতিফলনে আজ

আমরা এমন এক উপকণ্ঠে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি, যেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে পাই, সৃষ্টি জগতের অজানা দিগন্ত, দেখতে পাই পাশ্চাত্য কৃষ্টির সূতিকাগার। অভিজ্ঞতা আর তার কৃতিত্বের ঝুলি আজ ভরপুর। তারা আজ বলতে পারে (এমন কি বলেও), কুদরতের চেহারা থেকে আমরা পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি প্রতিটি অজানা দিক, পরিণতিতে যা হবার হয়েছে। মানুষের জীবনকালকে তারা সুখময় করেছে। জড়বাদের উৎকর্ষের সুফল এনে দিয়েছে ঘরে ঘরে। এতদ্সত্ত্বেও মানুষের মনে কেন যেন স্বস্তি আসছে না! জাগতিক জীবনে সকলেই যেন জানা আশংকায় দোদুল্যমান। জীবন-মন কেমন যেন অতৃপ্তকর মনে হচ্ছে! আস্বাদনের বস্তু আছে, কিন্তু স্বাদ নেই।

যুগের দাবী আজ, আমেরিকায় এখন এমন একটি মতবাদ দরকার, যা দিশেহারা জাতিকে সুপথ ও সুমতির সন্ধান দিতে পারে, দিতে পারে তাদের নয়া পয়গাম। কিন্তু জিন্দেগীর সেই লাগাম আজ হাতছাড়া হয়ে গেছে। জীবন চালনার দায়িত্ব পালন করছে এক্ষণে পাশবিক আত্মা। মনুষ্যত্ব আজ মাঠে মারা যাচ্ছে। পাশ্চাত্য দর্শন আজ তাদের এমন এক সমুদ্র তীরে উপনীত করেছে, যেখানে স্বপ্নের ঠিকানা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। লাগামহীন উদ্‌ভ্রান্ত ওদের জীবন। ওদের হাত-পা নেই সঠিক স্থানে। রক্তহীন জাতি আজ জানছে না, তাদের জীবনের গন্তব্য কোথায়? ওরা যেন কিসের মোহে মোহাচ্ছন্ন! এশীয় দার্শনিকদের দরকার আলোহীন এ জাতিকে আলোর সন্ধান দেয়া, জড়বাদের উৎকর্ষকে সঠিক কাজে ব্যয় করে তাকে একটি সুখী মহীরুহে পরিণত করা। কিন্তু পরিস্থিতি যেন কানে আঙ্গুল দিয়ে বলছে ঃ এশিয়াবাসি! তোমরা এর থেকে অনেক দূরে!

আশার ঝলক

প্রতিটি কাজের পেছনে তাকদীরে ইলাহী কাজ করছে ঃ

ذالك تقدير العزيز العليم -

"আল্লাহ তা'আলা আমাকে এদেশে সফর করার সুযোগ দিয়েছেন। এখানে শুধু হাতে-কলমে কাজ করা হয় না, বরং দিল-দেমাগ খাটিয়ে কাজ করার মত যথেষ্ট মুসলমান রয়েছেন। তারা ভার্সিটিতে কাজ করছেন। গবেষণা করছেন। অনেকে আমেরিকার শিক্ষালয়ে ধর্মের আলো বিকশিত করছে। দীক্ষিত হয়েছেন অনেকে ইসলামে। অপেক্ষায় আছেন কেউ কেউ। আমাদের বেলালী মুসলমানরা আশার প্রদীপে তেল সঞ্চার করছেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে আমেরিকায় আজ নব জাগরণের সৃষ্টি হয়েছে। আশার ঝলক উদ্গীরিত হচ্ছে। এক্ষণে এ রাষ্ট্র আমাদের কব্জায় থাকত, কিন্তু পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের দরুন, সীমাহীন বিলাসিতা আর

শ্রমবিমুখ হবার দরুন তা অলীক ইতিহাস হয়ে থাকছে। যখন তুর্কী সাম্রাজ্যের দাপট ছিল তখন পাশ্চাত্যে আমাদের একটা ভাবমূর্তি ছিল। স্পেনকে ধরে রাখতে পারলে আজ ইউরোপ-আমেরিকার সিংহভাগ অধিবাসী মুসলমান থাকত। জড়বাদের পূজারী না হয়ে ওরা ধর্মীয় বেড়াজালে বন্দী হতো। অত্যন্ত আফসোসের বিষয়, তখন আমরা চুপটি মেরে এসেছিলাম। ধর্ম প্রচারকগণ আজ যেমন দেশে মিশন নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন এমনটি করতে পারলে ইতিহাস ভিন্নরূপ হতো। কথিত আছে, আমেরিকা আবিষ্কারক ক্রিস্টেফর কলম্বাসের পূর্বে মুসলমানরা আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন। তখন থেকেই দাওয়াত কার্য পুরো দমে চালু হলে ইসলামী আলোয় জয় জয়কার হতো। কিন্তু সবই আজ তিক্ত ঐতিহ্যে পরিণত। পূর্বসূরীদের সেই প্রায়শ্চিত্ত আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে মুসলিম বিশ্ব।

অধুনা মুসলিম বিশ্ব আমেরিকার সেবাদাসে পরিণত। যেভাবে তারা পাশ্চাত্যের দরজায় ধরনা দিচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে, শ্বেত সন্ত্রাসীদের ক্রীড়নকে পরিণত। যে হারে পাশ্চাত্যবাসীদের পদাংক অনুসরণ করছে, তাতে বলা যায়, এগুলো সবই তাদের স্বোপার্জিত পাপের সাজা। কারণ তারা আল্লাহর অমীয় বাণী আর রাসূলের চিরন্তন নীতিকে বিশ্বদরবারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পৌছায়নি।

মুসলিম বিশ্বের সেই পাপ মুক্তির সময় এসেছে। তারা এক্ষণে বিভিন্ন দেশের শাসনকর্তা। ক্রমে ক্রমে তারা নতুন রাষ্ট্র দখল করছে। এতদ্সত্ত্বেও তারা একটি প্রজন্ম গড়তে পারছেন না। হেরেমের বহু শিক্ষানবীশ আজ এদেশে ভিড়ছেন। তাদের কাছে আমার আবেদন, আপনার জিম্মাদারী বুঝে নিন। পাশ্চাত্যের উচ্চ শিক্ষা আপনার উদ্দেশ্য নয়, বরং এখানকার সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনার পয়গম্বরী চিন্তাও আপনাকে করতে হবে। এদেশে এসে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার উপার্জন করে পরিবার-পরিজনকে সচ্ছলতা দান করা আপনার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। যে জিনিষটির অভাব এখানে, সে জিনিসটির অভাব পূরণ করতে হবে। আল্লাহ্ পাকই ইরশাদ করেন ঃ

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ -

অর্থ ঃ অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে।

আপনি বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ আর জড়বাদী উন্নয়ন দেখলে বুঝবেন যে, এটা কুরআনী আয়াতের নমুনা–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ -

অর্থ ঃ আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে।

আপনি পাশ্চাত্যের চরিত্রগত দুরবস্থা অবলোকন করলে সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য হবেন যে, ওরা আজ অধঃপতনের অতলতলে নিমজ্জিত। একদিকে তাকালে দেখবেন, ওদের জড়বাদী উৎকর্ষ, অন্যদিকে তাকালে দেখবেন মানসিক অস্থিরতা ও শিশুসুলভ প্রলাপ। একদিকে দেখবেন, ওরা চাঁদের দেশে আরোহণ করছে, অন্যদিকে নৈতিক অবক্ষয়ে তিলে তিলে ক্ষয় হয়ে অসভ্য জানোয়ারে পরিণত হচ্ছে। এ সেই আমেরিকা, জাগতিক জীবনের যে সব সমস্যার সমাধান দিয়েছে, কিন্তু যুবক শ্রেণীকে দিতে পারেনি চরিত্র গঠনের সবক। ইকবাল বলেন ঃ

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب و تاریك مسخر نه کرسکا -

"যারা সূর্যরশ্মিকে কব্জা করেছে, জীবন আঁধারের ঘোর অমানিশা থেকে তারা মুক্তি পায়নি।"

আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে পারি, এ হেন মহাক্রান্তিকালে মুসলিম বিশ্বের কোন প্রতিবাদী কণ্ঠ যদি সোচ্চার হয়ে আমেরিকাকে জানিয়ে দিত, হে পাশ্চাত্যবাসি! তোমরা ব্যর্থ। হে পাশ্চাত্য! তোমার রোগের ঔষধ আমাদের কাছে আছে। তোমার ব্যবস্থাপত্র হচ্ছে কুরআন ও হাদীসে রাসূল (সা.)। লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে, মুসলিম বিশ্বে এমন কোন প্রতিবাদী কণ্ঠ আজ নেই, যে আমেরিকার দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারে। ওরা সকলেই পাশ্চাত্যের ভজন গীত গাইছে। পাশ্চাত্য আশীর্বাদে মুসলিম বিশ্বের আপাদমস্তক ধন্য। আমাদের অজ্ঞাতে পরমুখাপেক্ষিতার সমালোচনা করছে। দরিদ্রতা আর দেউলিয়াত্ব আমাদের মাথায় চড়ে বসেছে। ভিক্ষুকের মত হাত পেতেছি ইউরোপের দরজায়। জাতির এহেন নাযুক মুহূর্তে বিশ্বমোড়লের দিকে চোখ তুলে বজ্র হুংকার দেয়া যেনতেন কথা নয়। বিশ্বে এমন কোন দেশ আছে কি, নীতিবুভুক্ষ আমেরিকার মুখে যে দেশ তুলে দেবে এক লোকমা নীতিখাদ্য, দেবে চরিত্র গঠনের সুপরামর্শ?

আপনারা দ্বীনের ধারক-বাহক

আমি উচ্চাশা পোষণ করে বলছি, ধর্মীয় সুন্দর জীবন যাপন, রুচিশীল চালচলন ও শিষ্টাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে আপনি বুঝিয়ে দিন, পাশ্চাত্যবাসীদের দেয়ার মত অনেক কিছু আপনার কাছে আছে। শুধু নিতে নয়, দিতেও জানেন আপনি। আপনার হাত শুধু নিতে উদ্যত নয়, বরং দান করতেও প্রশস্ত এবং এ ভার্সিটির শিক্ষক, ছাত্র, রিসার্চ স্কলার যা-ই হোন না কেন, সহকর্মীদের কাছে পেশ করতে পারেন ইসলামের কার্যকারিতা। জড়বাদী উৎকর্ষ

তাদের যা না দিতে পেরেছে, ইসলাম পারে তা দিতে। নিজকে সর্বদা একজন ধর্মপ্রচারক ভাবলে ক্ষতি নেই তো! নিষ্প্রাণ একটি পুতুলের মত না থেকে আপনি দিতে পারেন ওদেরকে ইসলামী কালজয়ী চিন্তাধারা। কলি যেমন নিজেকে উজাড় করে পুষ্প কাননকে বিকশিত করে, দ্বীনের জন্য তেমনি বিকশিত হোন আপনিও।

বিষয়টি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও আপনারা ভেবে দেখবেন বলে আশা করি। কুরআন ও নববী উসওয়া আমাদের আদর্শের রূপরেখা। যে সময় রাসূলের ঘরে খাদ্য ছিল না, ছিল না মদীনায় কোন সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র, ছিল না দেশ পরিচালনার পরিপূর্ণ সংবিধান। সেমতাবস্থায়ও তৎকালীন বিশ্বের পরাশক্তির (Super Power) কায়সারে রোম শামুয়েল (হেরাক্লিয়াস)-এর কাছে তিনি ইসলামের দাওয়াত পাঠিয়েছিলেন।

فانى ادعوك بدعاية الاسلام ، أسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين ....فان تولوا فقولوا شهدوا بانا مسلمون -

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম!

মুহাম্মদ যিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে এ পত্র রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে। হেদায়েতপ্রাপ্তদের ওপর সালাম বর্ষিত হোক! আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন। শান্তিতে থাকবেন। আল্লাহ্ আপনাকে সওয়াব দেবেন। পক্ষান্তরে এ দাওয়াত থেকে বিমুখ হলে মনে রাখবেন প্রজাদের গোনাহ আপনার ওপর নিপতিত হবে। হে আহলে কিতাব! এসো, এমন একটি কথার ওপর আমরা ও তোমরা এক ও অভিন্ন। তা হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারুর ইবাদত করব না। আমাদের কেউ যেন নিজেদেরকে প্রভু না বানাই! যদি এতে নিরঙ্কুশ বিশ্বাস স্থাপন করতে না পার, তবে সাক্ষী থেকো, আমরা বিশ্বাসী হয়েছি!"

আমরা তো সেই নবীর উম্মত, যিনি দরিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণে কোন অবস্থান ছিল না, সেই অখ্যাত অবস্থায়ও আল্লাহর সাহস বুকে আগলে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন, যাদের রাজকোষ ছিল শূন্য, খাদ্য ভাণ্ডারে ছিল না এক কাতরা খাদ্যও। সেমতাবস্থায় এভাবে নির্ভীক চিত্তে اسلم تسلم - এর মত বাক্য স্ফুরণ সত্যিই আশ্চর্যজনক! আমরা সেই রাসূলের (সা.) আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাই আমাদের কাজকর্মও তেমনটি হওয়া চাই। আমাদেরও এমন কিছু করার

দরকার আছে। আপনি ওদের জানিয়ে দিন, তোমরা ধর্মীয় আলো থেকে বঞ্চিত। ইসলামের আলো ছাড়া জাগতিক চোখ ধাঁধানো আলো তোমাদের বাঁচাতে পারবে না। পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ আত্মহত্যার মুখে। ওরা আজ এমন এক পরীক্ষায় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে যেখানে পতিত হলে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। একমাত্র আল্লাহর বিধান ওদের বাঁচাতে পারে। জড়বাদ আর অধ্যাত্মবাদের সংযোগ সেতু বন্ধনে রচিত করার জুড়ি নেই। জড়বাদ যে সমাজে প্রবল, অথচ অধ্যাত্মবাদ শূন্য, সে সমাজের পতন অনিবার্য। এ পয়গাম মুসলিম জাতির শোনানো দরকার ছিল। তাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হওয়া প্রয়োজন, 'হে পাশ্চাত্য! তুমি ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছ। আমরা তোমাকে বাঁচাতে চাই।'

কিন্তু মুসলিম বিশ্বের মাঝে আজ এ স্পন্দন নেই। তাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। ইসলামী তালীম দেয়া তো দূরে থাক, আজ পাশ্চাত্য তন্ত্রমন্ত্রে নিজেদের পরিত্রাণ খুঁজছে আত্মসম্ভ্রমবোধহীন জাতি। আপনারা শাসক না হলেও এ কাজটি সমাধান করতে পারেন। আল্লাহর বলের সাথে অদম্য স্পৃহাকে যোগ করে দাওয়াতের মহান কাজ কাঁধে তুলে নিতে পারেন। সাধ্যমত ধর্মীয় উদারতা প্রদর্শন, দোয়া ও তাসবীহ-তাহলীল দ্বারা এ কাজে মদদ পেতে পারেন। ভালো-মন্দ বোঝার মত জ্ঞান আপনাদের পর্যাপ্ত। সচেতন আপনাদের ধর্মীয় আত্মা। এ জগতই সব কিছুর শেষ নয়। এ জগত শেষে আপনাকে আরেকটি জগতে যেতে হবে। দাঁড়াতে হবে রাব্বুল আলামীনের সামনে। দিতে হবে জীবনের হিসেবে। সেই চিরঞ্জীব সত্তার রাজী খুশীকে জীবনের একমাত্র ব্রত করে নেয়া দরকার।

সুতরাং আপনারা আল্লাহবিমুখ পথহারা এ জাতিকে জীবনের অজানা দিকগুলোর সন্ধান দিন। বাস্তব ও অফুরন্ত জীবনের রহস্য উন্মোচন করুন। গীর্জা ও খ্রীস্টবাদের পাগলা ঘোড়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়েও যে জগতের সন্ধান পায়নি, সেই অনন্ত জীবনের সন্ধান দিন আপনারা। আমি বিশ্বাস করি, ওরা যা পারেনি, আপনারা তা পারবেন।

সমবেত শ্রোতামণ্ডলি! আমি আপনাদের অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি। আমার তড়পানো হৃদয়ের অনুভূতি ও ব্যথাভরা অভিব্যক্তি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আল্লাহর দরবারে আরজ করতে পারব, বিশ্বের সবচে' বড় মন্দিরে আমি আযান দিয়েছি, দিয়েছি তোমার দ্বীন প্রচারের তরীকা বাতলে। জাতির আত্মাভিমানী অসহায় এক বৃদ্ধের এ কথা দ্বারা ন্যূনপক্ষে একজন লোকও প্রভাবান্বিত হলে এ বক্তব্য সার্থক হবে। দোয়া করি, আল্লাহ্ আপনাদের সহীহ্ আমল দান করুন! দ্বীনের জন্য কবুল করে নিন!

হুঁশিয়ার! এ দেশেও যেন ইউরোপিয়ান ভাবধারায় ইসলাম সৃষ্টি না হয়

[১৯৭৭ সালের ৪ঠা জুন উত্তর আমেরিকার নিউজার্সি শহরের ইসলামী সেন্টারে অনুষ্ঠিত মাহফিলে মাওলানার ভাষণ। ভাষণের পূর্বক্ষণে মিশরের বিদগ্ধ আলিম সুলাইমান দানী সাহেব মাওলানার পরিচিতি তুলে ধরেন। মাওলানার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন ঃ আরবী/ইসলামী বিষয়ে আরব্য মনীষীদের পাশাপাশি ভারতীয় উলামাদের অবদান কোন অংশে কম নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে আরো বেশী। শ্রোতাদের মধ্যে আরব, ভারত ও পাকিস্তানের লোকজন ছিলেন। আরবী ভাষণ টেপ রেকর্ড থেকে অনুলিপি করা হয়। মাওলানা স্বয়ং তাতে সংস্কার কার্য চালান। মৌলভী শামস তিবরিজ উর্দু তরজমা করেন।]

মোহ্তারাম দোস্ত বুযুর্গ!

ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত এই সম্মেলনে যোগদান করতে পেরে নিজকে ধন্য মনে করছি। উত্তর আমেরিকা ও কানাডায় এ আমার প্রথম সফর। এর পূর্বে এখানকার জনগণের দ্বীনী মহাব্বত ও ধর্মীয় জীবন যাপনের ফিরিস্তি শুনে যার পর নাই খুশী হয়েছি। মনের স্ফীত ফুর্তি আগলে রাখতে পারছি না। বাস্তবিকই পৃথিবীর এই শেষ প্রান্তের অবস্থিত দ্বীনী ভাইদের এই বিশাল জলসায় মিলিত হতে পারা সত্যিই অকল্পনীয়। আপনাদের দ্বীনী তাগিদের প্রশংসা করে খাটো করতে চাই না।

আমি পরে অবশ্য জানতে পারলাম ইসলাম এখানে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে। যে জাতি বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও শিল্প বিজ্ঞানে (Technology) গোটা দুনিয়ার ওপর মোড়লী করছে, এমন কি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণেও তাদের দবদবা খাটো করে দেখার জো নেই। আল্লাহর শোকর! ইসলাম এদেশে আস্তে আস্তে অনুপ্রবেশ করছে। ইনশাআল্লাহ্ সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন এদেশই সারা বিশ্বের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবে।

এ দেশে আমি ইসলামের লক্ষণ দেখছি, এটা মুসলমানদের গর্ব ও খুশীর বিষয়। তবে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার দিকে তাকালে একটা সংশয় দানা বেঁধে উঠছে সেটা হলো, ইসলাম ও ইসলামী তাহজীব। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুর দূরে বহু দূরে অবস্থিত এই বেলাভূমিতে ইসলামীকরণের যে সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তাঁর ওপর আলোকপাত করেছেন আমার পূর্বেকার বক্তা তার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায়। বিজ্ঞ আলিম সুলাইমান দানী সাহেব বলেছেন ঃ ইসলাম কোনো দেশ-জাতি ও স্থান বিশেষে বিশেষিত নয়। আমিও এ কথার সাথে সম্পূর্ণ একমত, ইসলাম কোন রাষ্ট্র বা দেশভিত্তিক ধর্ম নয়; তবে একথা অনস্বীকার্য,

ইসলামের জন্য একটি পবিত্রভূমি ও যোগ্য পরিবেশের দরকার। সেই দেশ ও পরিবেশ থেকে ছড়িয়ে পড়বে ইসলামের আলো, ইসলামী মহান জীবন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবে অনৈসলামী বা নব দীক্ষিত জাতি। এজন্য ইসলামী বেলাভূমির দরকার। আরেকটু বেড়ে গিয়ে বলতে গেলে ইসলামের বিশেষ মৌসুমের দরকার, যার নির্দিষ্ট শুষ্কতা ও আর্দ্রতা বিশেষ কাজে আসে।

সত্যি বলতে কি, ইসলাম একটি জীবন্ত ধর্ম। এটা কোন মানব-মস্তিষ্কপ্রসূত ধর্মমত নয়, নয় কোন দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার ফসল যে তা মতবাদ কাগজ ও বাক্সবন্দী থেকে লাইব্রেরীর শ্রীবৃদ্ধি করে। ইসলাম স্রেফ আক্বীদাগত আমলগত টোটা-ফাটা ধর্মের নাম নয়, বরং ইসলাম একই সময় আক্বীদা, আমল মুআমাল ও চরিত্র গঠনমূলক অনুভূতিশীল সমন্বিত ধর্মমত মাত্র। এটা একটি নতুন প্রয়াস যা মানুষের স্পৃহাকে প্রবৃদ্ধি করে দেয় একটি নতুন জীবনের সন্ধানে। আল্লাহ্ তা'আলা কারো কাছে ইসলামের মর্ম বিকাশ করে দিলে সে ইসলামকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। তার জীবন সফলতার রঙে রঙীন হয়। মনে হবে যেন সে নতুন করে জন্ম নিয়েছে! তার মনের কুসংস্কার দূর হয়ে সেখানে নূর প্রতিভাত হয়েছে। ইসলামের বিজলি তার জীবনে এমনভাবে প্রভাব ফেলে, যেমন বিদ্যুৎ এক তার থেকে আরেক তারে চলাচল করে!

ইসলামের সঠিক দিক কারো কাছে স্পষ্ট করে ধরা দিলে সে দেখতে পাবে, এটা শব্দ, অর্থ ও পুঁথিগত ধর্ম নয়, বরং দেখবে এটা এক নব ও অনন্য ধর্মমত। তাইতো এ ধর্ম অনেক কিছু পছন্দ করে, আবার অনেক কিছু পছন্দ করে না। যেমন রাসূল (সা.) অনেক জিনিষ পছন্দ করতেন, আবার অনেক জিনিষ পছন্দ করতেন না। যেমন তিনি প্রতিটি ভাল কাজ ডান দিয়ে শুরু করতেন, এমন কি জুতা পরিধান ও মাথা আচড়াতে ডান দিক দিয়ে শুরু করতেন। এমনিভাবে অনেক জিনিষ তিনি অপছন্দ করতেন। বস্তুত ইসলাম একটি মননশীল ধর্ম, ঐশী ধর্ম বিশেষ এক মৌলিক মতবাদ। এর বিবরণী সরাসরি আসমান থেকে অবতীর্ণ। নিষ্পাপ নবীগণ এর বাহক। এখন আমরা উত্তরাধিকার হিসেবে পাচ্ছি তার ধারা।

এজন্যই আল্লাহ্ পাক ইসলামকে صبغة الله বলেছেন। ইসলাম যদি স্রেফ আক্বীদা ও আমল হতো, তাহলে তাকে নিছক আল্লাহর রঙ ও নমুনা বলে চালিয়ে দেবার প্রায়াস পেতেন না। صبغة

এর অর্থ হচ্ছে ছাপ, দাগ, সনাক্তকরণ চিহ্ন, বিচারধর্মী নিদর্শন। এটা তখনই সম্ভব, যখন মানুষে মানুষে, জীবনে জীবনে, কাজেকর্মে, বস্তুতে বস্তুতে, স্বাদে স্বাদে একে অপরের বিরোধী হবে। ইসলামবিরোধী যে কোন জিনিষের বেলায় শরীয়ত মানুষকে তা পরিহার করতে ঐ বৈরী জিনিষ চিহ্নিত করে দিয়েছে। বলেছে ঃ

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى -

'তোমরা জাহেলী নারীদের মত নিজেকে প্রদর্শন করো না।' এমনটি কেন বলা হলো? জাহেলী যুগ তো সে বহু আগেই অতিবাহিত হয়ে গেছে, তার পরেও জাহেলী যুগের পুনরাবৃত্তি করে কুরআন কেন লজ্জা দিচ্ছে? এটা এজন্য করা হচ্ছে জাহেলীয়াত একটি স্বতন্ত্র যুগের নাম। এতে ভালো-মন্দ, হালাল-হারাম, ফরজ-ওয়াজিব, আদেশ-নিষেধের কোন বালাই ছিল না। এ যুগকে আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ঘৃণা করেন, দিয়েছেন অভিসম্পাত। হাদীস শরীফে আছে ঃ

ان الله نظر الى اهل الارض........

"আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠ পানে আরবী-অনারবীদের দেখে নাখোশ হন। খুশী হন স্রেফ আহলে কিতাবদের দেখে।" (মিশকাত)

এই জাহিলিয়াত আল্লাহর কাছে অপছন্দ ছিল। অভিশপ্ত ঘোষণা করে বান্দাদেরকে তা পরিহার করতে বলেন। তাই ঐ জাহিলিয়াতের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে, তার থেকে আগাম হুঁশিয়ারী দিচ্ছেন ঃ

اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ -

'যখন কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতা যুগের জেদ পোষণ করত।' (সূরা ফাতাহ-২৬)

নবী করীম (সা.) কোন মুসলমানের মধ্যে জাহিলিয়াতের নামগন্ধ খুঁজে পেলে তাকে ধিক্কার দিয়ে বলতেন ঃ

انك امر فيك جاهلية -

'তোমার মধ্যে এখনো জাহেলিয়াতের ছাপ আছে।' (বোখারী খঃ ১, পৃঃ ৯)

হযরত আবুজর গিফারী (রা.)-এর মত একজন মহান সাহাবীকে যখন তাঁর গোলাম ও তাঁর মাঝে সম্পর্কের ফাটল দেখলেন, দেখলেন বাদানুবাদ করতে, তখন তাঁকে এই হাদীসে শোনালেন। একথা শুনে হযরত আবু জর গিফারী (রা.) এতই প্রতিক্রিয়াশীল হন যে, শেষ পর্যন্ত গোলামকে সমমর্যাদা দান করেন, এমন কি নিজে যে পোশাক পরেন, গোলামকে তা পরাতে শুরু করেন। নিজে যা খান তাকে তা খাওয়ান। আল্লাহ্ পাক ইসলামকে তাঁর রঙ বলে অভিহিত করেছেন। ইসলাম যদি একটি স্বতন্ত্র জীবন ব্যবস্থা না হতো, তাহলে তিনি এমন শব্দে ইসলামের পরিচয় দিতেন না।

صبغة الله و من احسن من الله صبغة -

"এটা আল্লাহ্‌র রঙের চেয়ে উত্তম রং আর কার হবে?" (সূরা বাকারাহ-১৩৮)

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আম্বিয়া কেরামের অনুসরণ করার জন্য বান্দাকে নির্দেশ দিচ্ছেন। পেশ করছেন সুদীর্ঘ পরিসরে আম্বিয়া কেরামের অনুকরণীয় সূচী ও নীতিমালা–

وَ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ ط كُلًّا هَدَيْنَا ج وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ط ....

"আমি তাঁকে দান করেছি ইসহাক ও ইয়াকুব। প্রত্যেককেই আমি পথ প্রদর্শন করেছি পূর্বে আমি নূহকে পথ প্রদর্শন করেছি–তার সন্তানদের মধ্যে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসূফ, মূসা ও হারূনকে। এমনিভাবে আমি সহকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। আরো যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াছকে, তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইসমাঈল, ইয়াসা, ইউনুস, লুতকে-প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের ওপর গৌরবান্বিত করেছি। আরও তাদের ওপর কিছু সংখ্যক পিতৃপুরুষ, সন্তান-সন্ততি ও ভ্রাতাদেরকে আমি মনোনীত করেছি এবং সরল পথ প্রদর্শন করেছি। এটি আল্লাহর হেদায়েত। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এ পথে চালান। যদি তারা শেরেকী করত, তবে তাদের কাজকর্ম তাদের জন্য ব্যর্থ হয়ে যেত। (সূরা আন'আম-৮৪-৮৯)

এরপর ইরশাদ করেন ঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ........

" এরা এমন ছিল, যাদের আল্লাহ্ সৎ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন।" (আন'আম-৯০)

আল্লাহ্ তা'আলা অনুসরণের এই হুকুম নবীর জন্য বিশেষিত করে দিয়েছেন যিনি চরিত্র, উত্তম আদর্শের মডেল ছিলেন। সুতরাং নবীর মুখ দিয়ে আল্লাহ্ পাক বলেছেন ঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ -

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ্ও তোমাদের ভালবাসেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন।" (আল ইমরান -৩১)

সত্যি বলতে কি, ইসলাম অন্য ধর্মের তুলনায় স্বতন্ত্র। যদি কোন খ্রীস্টান নিজেকে নাছরা পরিচয় দেয়, তাহলে এতটুকু তার জন্য যথেষ্ট। পরে সে তাহজীব, তামাদ্দুন, দর্শন, জীবনাদর্শ, চিন্তাধারায় যে কোন মতবাদের অনুসারী হতে পারে। আমার এক ভারতীয় দোস্ত একজন শিক্ষিত হিন্দুকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাইয়া বলুন তো! কোনো মুসলমানকে তার ধর্মীয় পরিচয় পেশ করতে বললে সে বলে ঃ যে ব্যক্তি কালেমা لا اله الا الله محمد رسول الله পড়বে এবং এ বিশ্বাস রাখবে সে-ই মুসলমান। এটাই মুসলমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এভাবে আপনাকে হিন্দু পরিচয় জিজ্ঞেস করলে আপনি কি বলবেন? আমি বিস্তারিত কোন উত্তর চাইনি। কেননা বিস্তারিত জানবেন ব্রাহ্মণ ও হিন্দু পণ্ডিতগণ। আমার হাতে স্রেফ ১/২ মিনিট সময় আছে, এর মধ্যে আপনি জানিয়ে দিন, হিন্দু ধর্মমত কি? কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে হিন্দু বাবা বললেন ঃ দেখুন! হিন্দু সব কথার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে। সব বিশ্বাসকে সে অস্বীকার করতে পারে। একজন লোক হিন্দু পরিচয় দিতে এতটুকু তার জন্য যথেষ্ট। আর কিছু তার দরকার নেই। এরপর সে যা-ই কিছু করুক না কেন, সে হিন্দুই থাকবে।

আমি বলতে চাই, ইসলাম এ ধরনের কেন ধর্মের নাম নয়। একটু আগে যেমন বললাম, ইসলাম একটি স্বতন্ত্র ধর্ম। ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মমতের মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করতে ইসলাম সিদ্ধহস্ত। ইসলাম তার গণ্ডি এঁকে দেয়, যাতে সহজেই বোঝা যায়, এটুকুই ইসলামের পরিসীমা। ইসলাম বহু পূর্বেই ঘোষণা করে দিয়েছে ঃ এটা ইসলাম, এটা কুফর। এতটুকু হালাল, এতটুকু হারাম, এটা জাহিলিয়াত, এটা ইসলাম।

পাক-না-পাকের গণ্ডি এঁকে দিয়েছে। একটি এলাকা চিহ্নিত করে বলেছে, এটা ইসলামের গণ্ডি, এর বাইরে গেলে মুরতাদ হয়ে যাবে। মুরতাদ কথাটি কেবল ইসলামের বেলায় প্রযোজ্য। কেননা অন্য কোন ধর্মে মুরতাদ কথাটি নেই, থাকলে তা যথার্থ নয়। মুরতাদ ইসলাম ধর্মের একটি বড় গুনাহ। হাদীসে এসেছে ঃ

و يكرهان ان يعود الى الكفر......

"পরিপূর্ণ মুমিন কাফের হওয়াকে তেমন ভয় করে, যেমন আগুনে পড়ার ভয়ে সে ভীতসন্ত্রস্ত থাকে।"

ইসলামের যখন এই সক্রিয়তা ও স্বতন্ত্র সত্তা, তখন ইউরোপ-আমেরিকার মুসলমানদের জিম্মাদারী অনেক বেড়ে যায়। কেননা ইসলাম অন্য ধর্মের মত নিছক মৌখিক স্বীকৃতির নাম নয়, আক্বীদা-আমল ইবাদতের নাম নয়। এমনটি হলে এ ধর্ম পালন খুব সোজা ছিল, কিন্তু এ ধর্ম এক বিশেষ রঙে রঙিন। এক অভিনব জীবন ব্যবস্থা, এক বিশেষ জযবা ও জোশের ধর্ম। স্পৃহা ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

ধর্মমত। অন্যান্য ধর্মমতের তুলনায় অধিক নাযুক ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। বস্তুগত মাপকাঠিতে এক বুনিয়াদী মতবাদ। তাই এ ধর্ম গ্রহণ করলে কাজকর্ম বহু হুঁশিয়ারীর সাথে করতে হয়। এজন্যই আমরা শুধু গবেষণা ও প্রবন্ধ শোনানোর ওপর ভরসা করতে পারি না। এ সব কিতাব ইলমী মানে যতই উচ্চ মাপের হোক না কেন, যতই উপকারী হোক না কেন, ইসলামকে এর ওপর সীমাবদ্ধ করা যাবে না। ইসলাম হচ্ছে একটি পরিবেশের নাম, একটি রং যেখানে আমরা তাকিয়ে ইসলাম দেখতে পাব, কানে শুনব তার আওয়াজ, হাতে ছুঁতে পারব তা। ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করতে পারব যা। এজন্য কানুন ও নীতিমালা মেনে চলতে হবে, আমাদেরকে কেবল সেই ভূ-খণ্ডে যেতে হবে, যেখানে ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মুসলিম জাতির বসবাস আছে। যেখানে একজন নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারে। মুসলিম জাতির আজ সংস্রবের প্রয়োজন। ঈমানদার বুযুর্গদের একান্ত সান্নিধ্যের দরকার। আমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখছি তিনি তাঁর নবীকে নেক্কারদের সাহচার্য অর্জন করার কথা বলেছেন (অথচ তিনি নিষ্পাপ এবং আল্লাহর একান্ত মাহবুব)।

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلَاتَعْدُ عَيْنٰكَ عَنْهُمْ ۚ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَاتُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهٗ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ وَكَانَ اَمْرُهٗ فُرُطًا -

"আপনি নিজকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনে সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছে, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা। আপনি তার আনুগত্য করবেন না।" (সূরা কাহাফ-২৮)

নিষ্পাপ নবী সম্পর্কে আল্লাহর নির্দেশ এমনটি হলে সাধারণ মুসলমানদের বেলায় কেমনটি হবে, তা বলা বাহুল্য। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ -

"হে ঈমানদারেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সংসর্গ অবলম্বন কর।" (তাওবাহ-১১৯)

এ দ্বারা বোঝা গেল, কিতাব মুতালা' রিসার্চ করা দ্বারা এই মাক্‌ছাদ হাসিল হয় না।

কানাডায় ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ছোট্ট শিশুর মত হামাগুড়ি দিয়ে চলছে। অতএব, এই নব জাগরিত দেশে বসবাসরত মুসলিমদেরকে সতর্ক হতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা একটু সচেতন হলে এদেশ অচিরেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ط وَ اِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ -

"যারা আমার (দ্বীনের) জন্য মেহনত করবে, আমি অবশ্যই তাদের সৎ পথ প্রদর্শন করব। আর আল্লাহর মদদ নেক্‌কারের জন্য রয়েছে।" (সূরা আনকাবুত-৬৯)

মোটকথা, যারা আল্লাহ্র দ্বীনকে বুলন্দ করার চিন্তা-ভাবনা করে, তিনি তাদেরকে এমন ঈমান, হিকমত, দূরদর্শিতা দান করেন, যার কল্পনা মানুষ করতে পারে না।

আমার মনে হয়, দ্বীন প্রচারের মহান ব্রত নিয়ে আপনারা প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে এদেশে এসেছেন। আপনাদের প্রবাস যদি মুবাল্লিগদের প্রবাস হয়, তাহলে সোনায় সোহাগা হবে! আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে, যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে হোক, এদেশে ইসলামী কৃষ্টি (Culture) চালু করতে হবে। একটি সত্য সুন্দর ধর্মের প্লাটফরম গড়ে তুলতে যত্নবান হতে হবে। ব্যক্তি থেকে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির সর্বক্ষেত্রে ইসলাম চালু করার পূর্বে মানবাধিকার নিয়ে ভাবতে হবে। সাহাবাদের নীতি এক্ষেত্রে অনুকরণীয়। তাঁরা ধর্ম প্রচারের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক দিককে বিকশিত করেছেন। তাইতো সাহাবারা ঈমান, আক্বীদা, চরিত্র গঠন, শৌখিনতা, সমাজ গঠন, মোটকথা জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপে ছিলেন মাপকাঠি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন ঃ

من راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن -

"মুসলমানরা যাকে ভাল মনে করেন, আল্লাহও তাকে ভাল মনে করেন।" মুহাদ্দিসীনদের নিকট 'মুসলিম' শব্দের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম অর্থাৎ সাহাবাগণ যাকে ভাল মনে করেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভাল মনে করেন। তাইতো ঈমান, ইসলাম দ্বীনের সর্বক্ষেত্রে সাহাবাগণ সত্যের মাপকাঠি। আপনাদেরকে এ পাশ্চাত্য নোংরা পরিবেশে এমন একটি সমাজ উপহার দিতে হবে, যা সাহাবায়ে কেরামের মহিমায় মহিমান্বিত । একজন আমেরিকান ও

কানাডীয় আপনাদের অশ্রুতপূর্ব সমাজ জীবন দেখে ইসলামের দিকে ঝুঁকতে পারে। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে তারা পিছে ফেলে আপনাদের দ্বীনী সংস্কৃতিকে যেন আঁকড়ে ধরতে স্বেচ্ছাপ্রবণ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

আমার সন্দেহ ও সংশয় হয়, আপনারা সাপের খোলসের মত আত্মগোপন করে থাকেন কি-না! খবরদার! যা কিছু জানেন তাকেই অবলম্বন করে নৈতিক বিপর্যয়গ্রস্ত এ সমাজগর্ভে আপনাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে ঢুকিয়ে দিন। নিজকে ছোট ভেবে পিছপা হবেন না কভু। আল্লাহ্ না করুন, আপনারা আত্মজ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে নিজের মাঝে সীমিত রাখতে আমেরিকার ইসলাম, ইউরোপীয় ইসলাম, জাপানী, ইরানী, ভারতীয় ও পাকিস্তানী স্টাইলের ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, যা অদৌ মদীনার ইসলাম নয়, এ দ্বারা পরস্পর পরিচিতি লাভ করতে পারবে না। এরূপ ইসলাম দ্বারা মানুষের স্বভাবজাত মতপার্থক্য থেকেই যাবে। আমেরিকার দ্বন্দ্ব এশিয়ার সাথে থাকবেই। জাপানীরা আফগানীদের সাথে মতানৈক্য করবেই। এমন একটি মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, যা দেখে অন্য জাতি আদর্শের কিছু খুঁজে পাবে না। এমনি ধরনের আধুনিক (Up-to-date) ইসলাম, অন্তঃসারশূন্য ধর্মমত মূল ইসলামের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন না হতে হয়, সেজন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। ইসলামকে সম্পূর্ণ সর্ববাদী ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। ইসলামকে সম্পূর্ণ জড়তাহীন প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করতে হবে, যাতে কোনো দিকই কারো কাছে অজানা না থাকে। ইল্‌মের জটিলতা আর উলামাদের গাফলতির দরুন আজ ইসলাম সকলের কাছে অপরিচিত হয়ে আছে। তাই আপনারা সেই গাফলতির দিকগুলো চিহ্নিত করুন, অজানা ও অনীহাগত দিকগুলোকে কানাডাবাসীদের সামনে পেশ করুন। হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) যদি প্রাচ্যের জন্য হতেন, তাহলে দ্বীন ইসলাম বিকৃতির হাত হতে রক্ষা পেত না। প্রাচ্যের বহু লোকের নিকট ইসলাম আজ অজানা থাকত।

সুতরাং আঞ্চলিকতাদুষ্ট, ভৌগোলিক ও আত্মপূজারী ভাবধারাসম্পন্ন ইসলাম থেকে হুঁশিয়ার হোন! মূল ইসলামকে আঁকড়ে ধরতে সচেষ্ট হোন!

এই বিষয়বস্তু, যা আল্লাহ্ আমায় বললেন, এই বিষয়টি আপনাদের জন্য যথার্থ মনে করছি, যুগোপযোগী মনে করছি ইউরোপ-আমেরিকাবাসীদের জন্য। ঘরে প্রত্যাবর্তন করলে আপনারা অনুধাবন করতে পারবেন, আমার টুটাফাটা এলোমেলো কথাগুলো। অভিজ্ঞতা এর সত্যায়নকারী। আল্লাহ্ আমাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন! কায়েম রাখুন সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর!

দুর্লভ মানবের সন্ধানে

[আমেরিকায় অবস্থানকালে আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী কর্তৃক শিকাগোতে প্রদত্ত ভাষণ]

মাওলানা রুমী (র.)-এর একটি প্রসিদ্ধ চরণ, যা আল্লামা ইকবাল তাঁর 'আসরারে খুদীতে' শিরোনাম করে লেখেন ঃ

وای شیخ باچراغ گشت گردشهر

کزدم دوز ملولم وانسانم ارزوست -

"মাওলানা রুমী (র.) বলেন, আমি জনৈক বুযুর্গ ব্যক্তিকে জ্বলন্ত চেরাগ হাতে নিয়ে কিছু তালাশ করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হযরত! আপনি কিছু অনুসন্ধান করে ফিরছেন কি? বুযুর্গ বললেন ঃ আমি হিংস্র ও চতুষ্পদ জন্তুর তাড়নায় বিরক্ত হয়ে মানুষ তালাশ করছি। আমার চতুষ্পার্শ্বে যে সব মনুষ্যমূর্তি আছে, এদের দ্বারা আমার অন্তর বিষিয়ে উঠেছে, ভেঙ্গে গেছে আমার ধৈর্যের বাঁধ। তাই খুঁজে ফিরছি একজন শেরে খোদা–একজন রুস্তমের মত বীর পুরুষ। কৌতূহলবশে আরজ করলাম ঃ হযরত! আপনি দুর্লভ বস্তুর সন্ধানে নেমেছেন। আপনি যা চাচ্ছেন, তার সন্ধান মেলা মুশকিল। বুযুর্গ বললেন ঃ এটাই তো আমার দোষ। যা দুর্লভ তার সন্ধানই করি সর্বদা।

সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলি!

আমি মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারের আহবানে এদেশে আসি নি। এসেছি একজন ছাত্র, একজন যৎসামান্য জ্ঞানের অধিকারী হিসেবে। আমার জন্য আমেরিকা এক নতুন জগৎ। শুধু এ কন্‌ফারেন্সে দাওয়াত দেয়ার জন্য নয়। এতে যোগদান উপলক্ষে গোটা আমেরিকা দেখতে পারব। মিলিত হতে পারব এখানকার অধিবাসীদের সাথে। নাতিদীর্ঘ এ সফরে তাদের লোক-লৌকিকতা যতদূর জানা যায় জানতে পারব। সুযোগটি আমাকে করে দিয়েছে এ সংস্থাটি। তাই তাদের আন্তরিক মোবারকবাদ দিচ্ছি। উত্তর আমেরিকার নিউ ইয়র্ক থেকে ক্যালিফোর্নিয়া, এমন কি কানাডার ৩/৪ হাজার মাইলও সফর করেছি। আমার সফরের অন্তিম লগ্নে হচ্ছে এ সম্মেলন। এক্ষণে আপনারা জানতে চাইবেন আমার সফরের অভিজ্ঞতা। জানতে চাওয়াটাই স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। হতে পারে, আমি এমন এক দেশের বাসিন্দা–শতাব্দীকাল ধরে যা পাশ্চাত্যের চেয়ে অনুন্নয়নশীল। যৌক্তিক দৃষ্টিকোণে তাই পাশ্চাত্যের মত উন্নয়নশীল দেশের প্রশংসা করার দরকার ছিল। দরকার ছিল এদেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন-অগ্রগতির উপাখ্যান শোনানো, কিন্তু এসব করতে গেলে 'মা'র কাছে মামা বাড়ির গল্প' শোনানো হবে। তাই ওদিকে যাচ্ছি না। আমার চেয়ে আপনারা অনেক বেশী জানেন।

আমি আপনাদের সম্মুখে মাওলানা রুমীর ক'ছত্র শুনিয়েছি, যা অনেকের কাছে রহস্যজনক মনে হতে পারে। মাওলানা সাহেব এমন এক দেশের বাসিন্দা ছিলেন, জাগতিক উৎকর্ষ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পকলায় যে দেশ এতটুকু পিছিয়ে ছিল না। রুমীর জন্মভূমি তদানীন্তন বিশ্বের সবচেয়ে নামকরা সভ্য ও সংস্কৃতিশীল দেশ ছিল। তিনি যে শহরে বসবাস করতেন, সে শহর সেলজুকীদের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। নাম তার 'বলখ'। তৎকালে 'বলখ' মডেল সিটি বলে খ্যাতি কুড়িয়েছিল। একে প্রাচ্যের 'গ্রীস' বললেও অত্যুক্তি হবে না। এটি ছিল সাহিত্য, শিল্পকলা, কাব্য চর্চা ও দর্শনের লীলাভূমি। এগুলো নিছক কথার কথা নয়, ইতিহাসের ধূসর পাতাগুলো উল্টালে দিবালোকের ন্যায় তা-ই আপনাদের সামনে প্রতিভাত হবে।

সেই উন্নত দেশের একজন নাগরিক হয়ে মাওলানা সাহেব অন্তরের চেরাগ আর মনের ধুকপুকসর্বস্ব অস্থিরতাকে কাব্যে রূপ দিয়েছেন। বলাচ্ছেন নিজের মনের অভিব্যক্তি অন্যের মুখ দিয়ে। শোনাচ্ছেন জনৈক বুযুর্গের কৌতূহলী উপাখ্যান। সত্যি বলতে কি, এসব তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। অন্যের মুখ দিয়ে তো নয়, প্রকারান্তরে খোদ নিজেই বলছেন ঃ পত্র-পুষ্পে পল্লবিত এ শহরের একজন বাসিন্দা আমি। মানুষের বাহ্যিক রূপ দেখে আমার শংকা অন্তহীন। এখানে সবই আছে। তবুও যেন কী নেই! সবই পেয়েছি এখানে। তবুও যেন কী পাইনি! গগনচুম্বী প্রাসাদ, নয়নাভিরাম শহর, চোখ জুড়ানো বাগ-বাগিচা, নজর কাড়া প্রকৃতি, জনাকীর্ণ মহল্লা, রকমারী খাদ্যসম্ভার, নানান রংয়ের পোশাক, সভ্যতার দহরম মহরম। কি নেই এখানে! সবই আছে। নেই শুধু পুণ্যবান মানুষ। আছে শুধু মানবরূপী কিছু জীবন্ত কংকাল, আদৌ যাকে মানুষ বলা যায় না। অন্য এক স্থানে তিনি এ কথাকে রূপ দিয়েছেন এভাবে ঃ

این نه مرنند اینهاں صورت اند

مرده نانند و گشته شهوت اند -

তোমরা যাকে মানুষ ভাবছ, ওরা আসলে মানুষ নয়। ওরা পেটপূজারী, জৈবিক চাহিদাসর্বস্ব প্রাণী বিশেষ।

অগণিত মেশিনারীতে সয়লাব

নাতিদীর্ঘ সফরে আমেরিকার পর্যটন কেন্দ্রগুলো আমাকে দেখানো হয়েছে। পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কোনটাই বাদ রাখা হয়নি। আমি দেখেছি, মেশিনারী পদার্থের বিপুল সমাহার। দেখেছি গাণিতিক, শৈল্পিক, কলা-কুশলীর ছাপ, দেখেছি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে পাশ্চাত্য আজ আহা

মরি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, মানবতাকে যা দেয়া দরকার, পৌছানো দরকার যতটুকু শান্তি-সুখ আর সংহতির, নিজকে উজাড় করে তার সবটুকুই সে দিয়েছে। কিন্তু জনাকীর্ণ এই শহরের উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ঃ এখানে প্রকৃত মানুষ ক'জনা যাদের অন্তঃকরণ মানবতার দরদে ব্যথাতুর, নির্মিলিত আঁখি অশ্রুসজল, উপেক্ষিত জনতার হৃত অধিকার আদায়ে যাদের মন জ্বালাপোড়া করে? যারা সত্য ন্যায়ের প্রতীক, সভ্যতা যার কথামত চলে, তিনি সভ্যতার কথামত চলেন না। সংস্কৃতির নরম তুলতুলে কোলে যিনি আপনাকে বিসর্জন দেননি, বরং সংস্কৃতিই তার কোলে মাথা গুঁজেছে। জীবন চালনার লাগাম যার হাতে, আনাড়ী লাগাম-তাড়িত নন যিনি। এরকম ক'জন মিলবে এখানে? মিলবে কি কোটি মানুষের ভীড়ে দু'চারজন?

এ রকম ক'জন মিলবে যারা আপনার সৃষ্টিকর্তাকে চেনেন, যাদের অন্তঃকরণ স্রষ্টার মুহাব্বতে পরিপূর্ণ? ইনসানিয়াতের দরদে ব্যাকুল? যাদের দৈনন্দিন জীবন সাদাসিধা? প্রভু প্রেমে গদগদ? মানবতার মায়ায় পেরেশান? জাতির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের মতপার্থক্য ও রাজনৈতিক নেতাদের একগুঁয়েমিকে প্রশ্রয় দেন না। রাষ্ট্রের বিপদাপদ দেখলে যারা শিউরে ওঠেন? রাষ্ট্রের সঠিক উন্নয়ন-অগ্রগতি যার স্বপ্ন, নিঃস্বার্থ সেবা করতে যিনি আগ্রহী, যিনি কিছু দিতে হাতেমদিল, নিতে নারাজ? ত্যাগে অকুণ্ঠ, খরচ করতে মহৎ। দান-দক্ষিণায় যার হাত উত্থিত, আঁচল পেতে নেয়ার মত নন যিনি, মজলুম মানবতার চিন্তায় যার বিনিদ্র রজনী কাটে, দুনিয়া আনন্দময় যার যা মনে লয়ে'র মত নন যিনি? নিরন্নকে অন্ন দানে যিনি তৃপ্তিবোধ করেন, হারানোতে প্রাপ্তি, লিপ্সা-মোহে মোহাচ্ছন্ন নন যিনি, গোটা বিশ্বকে এক ও অভিন্ন দেখতে চান যিনি? জীবনে উত্থান-পতন সম্পর্কে যার অভিজ্ঞতা আছে, কোন মহান সত্তার সকাশে জবাবদিহি করতে হবে–এ বিশ্বাস রাখেন যিনি, যিনি মনে করেন, চতুষ্পদ জন্তুর মত খেয়েদেয়ে বিলীন হয়ে যাবার মত নই আমি। দু'দিনের খেলাঘরের খেলা শেষ হলে আমাকে দাঁড়াতে হবে কোন সত্তার সামনে, যে নীড়ে এতদিন থেকেছি, কড়ায়-গণ্ডায় হিসেব দিতে হবে তার, যে অবিনশ্বর সত্তা নির্জীব মাটির মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেছেন, বানিয়েছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতি, বিছিয়ে দিয়েছেন চাটাইবৎ পাটি, মাথার ওপরে ছাদস্বরূপ দাঁড় করিয়ে রেখেছেন সুবিশাল আকাশ, যিনি আমাদের সৌর রশ্মি দান করেছেন, মেধাবলে চাঁদের বুকে পা এঁকে দেয়ার শক্তি দিয়েছেন, যারা একথা উপলব্ধি করেন, গোটা জড় জগৎকে আমাদের খাদেম করে দেয়া হয়েছে? কিন্তু কেন? এ কেনটির উত্তর যিনি সংগ্রহ করতে পারেন, এমন মানুষ আছে কি এদেশে?

সত্যি বলতে কি, জড় পদার্থ আর বস্তুর গোলামী মানবতার প্রকৃত উৎকর্ষ নয়। প্রকৃত উৎকর্ষ হচ্ছে পদার্থকে নিজের গোলাম বানানোর মধ্যে।

পিঞ্জিরাবদ্ধ কয়েদী

যে ব্যক্তি জমিনে আল্লাহর হুকুমত কায়েম করতে চান, প্রতিষ্ঠিত করতে চান একচ্ছত্র কর্তৃত্ব গোটা জগতের সামনে যিনি নিজকে মোড়ল প্রমাণ করতে চান না, এমন কি দুনিয়ার কোন রাষ্ট্র কিংবা পার্টিকে কোন পরাশক্তির লেজুড় বানাতে যিনি নাখোশ। আওয়ামকে আত্মার গোলামী, কু-প্রবৃত্তির গোলামী, ধন-দৌলত ও পুঁজিবাদের গোলামী থেকে মানবতাকে মুক্তি দিতে চান, প্রকৃত মানুষ তিনি না হলে হবেন কে?

আরবের জনৈক বৃদ্ধ, ঐশী বল যাকে নির্ভীক বানিয়েছিল, সে বলিষ্ঠ দৃপ্ত কণ্ঠে ইরানের সিপাহসালার রুস্তমকে লক্ষ্য করে বলেছিল ঃ

ان ابتعثنا لنخرج من نشاء من عبادة العباد الى عبادة الله ومن ضيق الدنيا الى وسعتها -

"আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের গোলামী থেকে মানুষকে আল্লাহর গোলামী করার সবক দিতে তোমাদের কাছে আমাদের প্রেরণ করেছেন।"

যে রুস্তমের নাম শুনলে সৈন্যদের পিলে চমকে উঠত। শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত কণ্ঠতালু, তার সামনে দাঁড়িয়ে এ ধরনের বিস্ময়কর উক্তি চাট্টিখানি কথা নয়! ঐ বৃদ্ধের কথায় সেদিন সাসানী সাম্রাজ্যের ভিতে কাঁপন ধরেছিল।

সে রুস্তমকে লক্ষ্য করে বলেছিল ঃ সাম্রাজ্যের নামে তোমরা মানবতাকে গোলাম করে রেখেছ, ইসলাম ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে এসেছে সেই নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি। সাসানী রাজত্বের ছদ্মাবরণে রাজতন্ত্রের যে ন্যক্কারজনক অধ্যায়ের অভ্যুদয় ঘটিয়েছ তোমরা, ইসলাম এসেছে সেই বংশগত সংকীর্ণতাকে মিসমার করে তার ওপর হকের পতাকা উড্ডীন করতে। আমরা এসেছি তোমাদের পাশবিক আচার-আচরণের সৌধচূড়া ভেঙ্গে সেখানে আরব্য উদারতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে। হে হতভাগ্য ইরানীরা! তোমরা পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখির ন্যায় লৌহ খাঁচায় আটকে আছ। তোমরা হাসি ও ক্রীড়া-কৌতুকে নিমগ্ন। আল্লাহর নেয়ামতকে ঢালাওভাবে ভোগ করছ। তোমরা অভ্যাসের দাস। বিলাসবহুল কৌতুকসামগ্রী আঞ্জামকারীদের দাস। চাকর-চাকরানীর দাস। বাবুর্চিদের দাস। পক্ষান্তরে আমরা শুধু আল্লাহর দাস। তোমরা এমন অসংখ্য যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। নিষ্প্রাণ পাথরকে বসিয়েছ আল্লাহর আসনে। আমরা এসেছি সেই দেবতার উপাসনা থেকে তোমাদের মুক্তি দিতে। তোমাদের

চরিত্রহীনতার হিসেব কষবে কোন্ যন্ত্র? বস্তুর মায়া তোমাদের অন্তরে সুসংহত। ইসলাম ছাড়া তোমাদের মুক্তি নেই। যে জাতি গোলামী জিন্দেগীকে প্রাধান্য দেয়, তাদের দুর্গতি রুখতে হেজাজের কাফেলা ছুটে এসেছে ইরানের ভূমিতে। এর ছায়াতলে থেকে তোমরা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবে, পাবে স্বস্তি। এই আমাদের আশা, প্রত্যাশা ও অঙ্গীকার।

আলো একটি, অন্ধকার অনেক

মুক্তির পথ একটি। গোলামীর পথ অসংখ্য-অগণিত। নূর বা আলো একটি, অন্ধকার অনেক। আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পারেন, কুরআনুল করীমে যেখানেই নূরের আলোচনা করা হয়েছে, সেখানে একবচন ব্যবহার করা হয়েছে!

الله ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور -

"আল্লাহ্ তা'আলা মুমিনদের অভিভাবক, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিশা দেন।"

আরবী ব্যাকরণে কি নূরের বহুবচন হয় না? কুরআনের আলোচনার আঁচল আদপেই কি সংকুচিত? আসল কথা হচ্ছে নূর একটাই। পক্ষান্তরে অন্ধকার অগণিত। নূরের স্রোতধারা একটি। সেটি হচ্ছে, আল্লাহর মারেফাত। এখান থেকে নূরের সংযোগ না হলে হেদায়েতের আশা কল্পনাতীত। প্রতীচ্যের এ দেশ সফর করে আল্লামা ইকবালের ক'চরণ মনে পড়ছে। ইকবাল এদেশে কোনদিন পদধূলি দেননি। কিন্তু পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতার উপলব্ধি আমার আপনার চেয়ে তাঁর অনেক বেশী ছিল। শুনুন ইকবালের কণ্ঠে ঃ

یورپ میں بہت روشنی علم هنر هے
سچ یہ هے کہ بے چشمہ حیات هے یہ ظلمات -

"পাশ্চাত্য এমন এক সমুদ্রের নাম যেখানে আবে হায়াতে'র কোন অস্তিত্ব নেই।"

লোকমুখে একটি প্রবাদ আছে, অন্ধকার সমুদ্রে 'আবে হায়াত' (জীবন সঞ্জীবনী পানি) পাওয়া যায়। কথিত আছে, সেকেন্দার রুমি হযরত খিজির (আ.)-এর কাছে হার মেনে বললেন, না! আমি পারলাম না আপনাকে গন্তব্যে পৌছতে। এটাকেই ইকবাল মরহুম তাঁর কলমে প্রকাশ করেছেন ঃ এ জগৎ অন্ধকার জগৎ। এখানে প্রকৃত মানুষ নেই বললেও চলে। যে জাতি ঐশী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, যাদের হাত থেকে ছুটে যায় নবুওয়াতী ছোঁয়া, সসীম

জ্ঞানের ওপর যারা ভর করে থাকে, বস্তুবাদের ওপর যাদের দিনরাত্রির মেহনত উৎসর্গীকৃত, লোহালক্কর আর কলকব্জার উন্নতি যাদের স্বপ্ন, আত্মশুদ্ধির স্থলে যারা বস্তুর ওপর মেহনত করছে, তাদের পরিণতি এমনই হয়! বস্তুর কাছে যারা নতজানু, আত্মার কাছে যারা নতশির, তাদের দ্বারা কিইবা আশা করা যায়! পাশ্চাত্যের ভোগবাদীরা বস্তুগত উৎকর্ষকেই পার্থিব জীবনের একমাত্র ব্রত বানিয়েছে। নিয়তির অমোঘ নীতি আবহমানকাল ধরে চলে আসছে−যে কেউ যা করতে চায় তিনি তাকে তা করতে মদদ করেন। যিনি জীবন কালকে যে ধাঁচে পরিবর্তন করতে চান, কুদরত তাকে সেভাবে সাহায্য করে। এক্ষণে জগৎ মাঝে যা কিছু হচ্ছে, তাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে আল্লাহর কুদরত-ই মদদ জোগাচ্ছে।

খ্রীষ্টবাদ ইউরোপে বেমানান

আপনার যারা পাশ্চাত্যের ইতিহাস ও এখানকার তামাদ্দুনগত উন্নয়ন-অগ্রগতির ওপর গবেষণা করেন, যারা ড্রিপর প্রণীত 'ধর্ম ও বিজ্ঞানে সংঘাত' নামক পুস্তকখানা পড়েছেন, যারা রাষ্ট্র ও গীর্জার দ্বন্দ্ব, ধর্ম ও বিজ্ঞানের রক্তক্ষয়ী উপাখ্যান সম্পর্কে ধারণা রাখেন, তারা জানেন, গীর্জার পোপ-পাদ্রীগণ খ্রীষ্টবাদকে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত করে খ্রীষ্টের বাণী গোটা বিশ্বে পৌছে দিয়েছেন। খ্রীষ্টের আদর্শগত বাণীর মোহে ইউরোপবাসী আজ মোহাচ্ছন্ন! অথচ ঐ সব পোপ-পাদ্রীগণই ধর্মভিত্তিক জীবন যাপন না করে বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণার পিছু নিয়েছেন। গীর্জায় আজ ধর্মের ঠাঁই নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে ফায়দা লুফে নিয়ে এদ্বারা জীবন গঠনের সুযোগ অন্তত আজ খ্রীষ্ট ধর্মে নেই। এ ধর্ম ইউরোপবাসীদের ক্রমশ পিছে টানছে। গোটা ইউরোপবাসী একদিন হতাশার নিঃসীম আঁধারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। ধর্ম চাচ্ছিল তাদের আশার প্রদীপে তেল সঞ্চার করতে। কুদরতের স্নেহার্দ্র ছোঁয়া ওদেরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। সভ্যতার দাবীদার ইউরোপবাসীদের মধ্যে যখন নৈতিক এ হারজিতের খেলা চলে আসছিল, ধর্ম এসে ঠিক এ সময় তাদের মাঝখানে দাঁড়াল। শেখাল সভ্যতার সবক। কিন্তু ধর্ম আর গীর্জার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ওরা বস্তুবাদের পেছনে লেগে গেল। ওদের শিরা-উপশিরায় বস্তুর মায়া জেঁকে বলল। বস্তুকে ওরা জীবন-মরণের মূল হাতিয়ার বানাল। ফলে যা হবার তা হলো। মানবতার সু-উচ্চ আসন থেকে ওরা পশুত্বের অতল তলে নামল।

শিল্প বিপ্লব দ্বারা ইউরোপ ভূমিতে ওরা এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করল, যেখানে বাইবেল আর গীর্জার কাছে ধরনা দিতে না হয়, বাছ-বিচার করতে না হয় কোনটা জায়েজ আর কোনটা না-জায়েজ? সত্যি বলতে কি, এটা মানবতার বিপর্যয় খ্রীষ্টবাদের বিপর্যয়।

যিনি ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন, তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ইউরোপবাসীদের নগ্নতার দিকে কোন্ ধর্ম টানছে? উত্তরে তাকে বলতে হবে, খ্রীস্টবাদ ছাড়া আবার কে! পক্ষান্তরে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, ইউরোপবাসীদের অতৃপ্ত মন-মগজকে তৃপ্ত করতে, সঠিক পথের দিশা দিতে, সত্য স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে, চাওয়া-পাওয়াকে সুষ্ঠ সুন্দর করতে, হেঁয়ালী জীবন থেকে প্রকৃষ্ট জীবন বিধান দিতে, মানবতাকে এক নব জীবন দান করতে কোন্ ধর্ম ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে? বিবেকবান ব্যক্তির জন্য 'ইসলাম' জওয়াব দেয়া ছাড়া গত্যন্তর আছে কি?

খ্রীস্টীয় বিশ্বাসে মানুষ রাশি রাশি পাপ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। জন্মের সূচনা থেকেই সে এক ভারবাহী বোঝা বইতে থাকে। এর চাপে কোমর ন্যুজ হয়ে আসে তার। একজন নিরঙ্কুশ খ্রীস্টান হিসেবে 'জন্মগত পাপী' বিশ্বাস রাখা ফরয। যে ব্যক্তি গোনাহর সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, জন্মগতভাবে চাপিয়ে দেয়া গোনাহর কারণে যে লজ্জিত, পৃথিবীর সম্মুখে সে কি করে মুখ দেখাবে? ধর্মীয় উদারতা তার পক্ষে প্রদর্শন করা সম্ভব কি? সাগরের বুক চিরে কি করে সে মুক্তো আহরণ করবে? মহাকাশ বিজয় করে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে সে যেতে পারবে কি?

জন্মগত পাপের লজ্জায় সে এক অবাঞ্ছিত কাফ্ফারার সম্মুখীন হলে এই পীড়া তাকে আজীবন কুঁরে কুঁরে খাবে। জীবন নাটকের মঞ্চে দাঁড়িয়ে একবুক জ্বালা নিয়ে তার পক্ষে বাকি অংকগুলো মঞ্চায়ন করা সম্ভবপর হতে পারে কি? এ রকম তালগোল পাকানো বৈসাদৃশ্যের ধর্ম পৃথিবীতে আর আছে কি-না কে জানে? ইউরোপের অবস্থা ঠিক ঐ গাড়ির মত, দু'টি ঘোড়া যাকে সামনে-পিছে থেকে টানছে। এ দেশের মানুষ যখন যান্ত্রিক প্রযুক্তিতে আহা মরি পর্যায়ে পৌছল, ঠিক সেই মুহূর্তে খ্রীস্টবাদের পাগলা ঘোড়া এসে তাদের মাঝখানে দাঁড়াল। একদিকে বিজ্ঞান তাদেরকে প্রগতির সবক দিচ্ছিল, অপরদিকে 'তওবা আস্তাগফিরুল্লাহ' বলে গীর্জা তাদেরকে বৈরাগ্যবাদের তালিম দিতে লাগল। বিজ্ঞান আর গীর্জার রশি টানাটানিতে অসহায় ইউরোপবাসীর জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে এল। ওরা দেখল-গীর্জাকে জীবন থেকে বিদায় করে না দিলে প্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন তো সম্ভব নয়। এসো! সকলে জোট বেঁধে জীবন মঞ্চ থেকে গীর্জাকে বিদায় (Good Bye) জানাই। শুরু হলো ওদের ধর্মমুক্ত জীবন। শুরু হলো এখান থেকে অধঃপতন।

দার্শনিক 'লেকে'র 'আখলাকে ইউরোপ' পুস্তকখানা উল্টিয়ে দেখুন! সেখানে লেখা আছে-অধুনা ইউরোপবাসী নারীদের থেকে বিমুখ থাকে, এমন কি গর্ভধারিণী মায়ের সাথে পর্যন্ত দেখা করতে ওদের বিবেকে বাঁধে। সন্তানের মায়ায় দূরপাল্লার পথ পাড়ি দিয়ে মা যখন তার সন্তানকে দেখতে আসেন, তখন সন্তান তাকে দেখে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করে, যেমনটি করে শয়তান আজান শুনলে।

ইউরোপবাসী গীর্জাবিমুখ হবার দরুন তারা যেমন অধঃপতনের শিকার হয়েছে, ঠিক এমনটির-ই শিকার হয়েছিল মুসলিম জাতি যখন তারা ইসলামকে তাদের জীবন থেকে বিদায় দিয়েছিল।

মেশিনের গোলামী

আধুনিক আমেরিকা মেশিনের গোলামে পরিণত হয়েছে। আমেরিকা আজ তামাম দুনিয়ার মোড়ল সেজেছে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গোটা বিশ্বের ওপর আমেরিকার বলয় কোন না কোনভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। কোন দেশই এ ধারা থেকে বিয়োজ্য নয়। ইসলামী-অনৈসলামী বিশ্ব কোন না কোনভাবে আমেরিকার মায়াজালে আটকা পড়ে অসহায় ঘুঘুর মত ছটফট করছে। আমাদের সংসদ, আমাদের ক্যান্ডিডেট, টাকা-পয়সা সবই আমাদের, কিন্তু গ্রীনরুমে বসে সুতা টানে আমেরিকা। এই বিশ্ব বসের রিমোট কন্ট্রোলে সারা দুনিয়া পরিচালিত হচ্ছে। এর বোতাম চালনে গোটা বিশ্ব ওঠা-বসা করে। পক্ষান্তরে আমেরিকা কার কথায় ওঠাবসা করে? সত্যি বলতে কি, আমেরিকা কিন্তু মেশিনের গোলাম হয়েছে। বস্তুবাদের গোলামীকে বরণ করেছে। শুধু কি তাই? ওরা বিলাসী জিন্দেগীর গোলাম। ফ্রি সেক্সের গোলাম। যেমন খুশী তেমন উচ্ছৃঙ্খল জীবনের গোলাম। লোহা-লক্করের টরেটক্কা ছাড়া ওদের ঘুম আসে না। এগুলোর ওপর রিসার্চ-স্টাডি করতে করতে ওদের মাথার চুল পড়ে গেছে। আজ যে জিনিসটির অভাব আমেরিকার সমাজে অনুভূত হচ্ছে, তা হলো একজন খাঁটি মানুষ যার অন্তরটা নির্মল নিষ্কলুষ। মেশিনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ওরা সাক্ষাৎ এক একটা মেশিনে পরিণত হয়েছে। ওদের উপলব্ধি পর্যন্ত মেশিন হয়ে গেছে। মায়া-মমতা বলতে ওদের অন্তরে কিছুই নেই। ধর্মের নাম শুনলে তাই ওরা নাকে কানে তেল তুলো দেয়। এটাই হলো আমার আমেরিকা সফরের অভিজ্ঞতা।

আত্মপক্ষ সমর্থন অনুচিত

আমেরিকা ত্যাগের কালে নিজকে লক্ষ্য করে বলতে চাই, হে মুসাফির! তুমি এ পাপময় জগতের জৌলুসে প্রভাবিত হয়ো না। তুমি নবুওয়তী বৃক্ষের ফসল। আপনাদের উদ্দেশে বলতে চাই, নিছক শৌখিন ভরে বাস করেছেন-আপত্তি নেই। কিন্তু বস্তুবাদের পূজারী হবেন না। আপনারা এই অসভ্য সংস্কৃতির শেখানো বুলি আওড়াবেন না। নিজের জীবন-বিধান, লোক-লৌকিকতাকে তুচ্ছ নযরে দেখবেন না। ওদেরকে মানুষ আর আপনাকে পরও ভাববেন না। কে বলেছে, ওরাই মানুষ? প্রকৃত মানুষ তো আপনারা। রাত্রিকে দিনে পরিণত করার যে আলোকসজ্জা দেখছেন, এটা বাস্তবিক আলো

নয়। বাস্তবসম্মত আলো হচ্ছে রহমতের আলো। হেদায়েতের আলো। এই আলো আমেরিকায় জ্বলে না। এই আলো থেকে আমেরিকা বঞ্চিত। ইকবাল কত সুন্দরভাবে বলেছেন ঃ

تاریك هے افرنگ مشینوںکے دهوائے سے
یه وادی ایمن نهیں شیان تجلی -

"মেশিনের কালো ধোঁয়ায় চারদিক ধোঁয়াচ্ছন্ন। এ উপত্যকায় তাই কোন নিরাপত্তা নেই, নেই কোন আলোর ঝলকানি।"

স্বহস্তে গড়া মূর্তিপূজারী

এরা আপনার অভ্যাসের গোলাম। স্বহস্তে গড়া মেশিনারী গোলাম। হযরত ইব্রাহীম (আ.) সমকালীন মূর্তি পূজারীদের লক্ষ্য করে বললেন, একি তামাশা করছ তোমরা? আজ যা নিজ হাতে গড়ছ, কাল তার পদতলে মাথা ঠুকছ? ঠিক এ অবস্থাই দাঁড়িয়েছে আমেরিকাবাসীদের জীবনে। আজ একটি উপাদান আবিষ্কার হচ্ছে, একটি মেশিনের অভ্যুদয় ঘটছে, কালকেই গোটা জাতি ঐ মেশিনের গোলাম হয়ে যাচ্ছে। একেই বলে স্বহস্তে গড়া মূর্তিপূজারী।

আযর ঘরে ইব্রাহীম (আ.)-এর প্রতিনিধি

এ দেশটি একটি বিশাল আযর ঘর। সুধীমণ্ডলি! এখানে ইব্রাহীমী আযানের প্রয়োজন আছে। আপনারা শোনাতে পারেন সে আযান। আপনারা ইব্রাহীম (আ.)-এর যোগ্য উত্তরসুরি, ইহুদী খ্রীস্টানরা নয়। কারণ ওরা ইব্রাহীমী রাস্তা থেকে বিচ্যুত। ইব্রাহীম (আ.)-এর স্মৃতিচারণ ওদের মুখে শোভা পায় না। ওরা মিল্লাতে ইব্রাহীমী থেকে বহু দূরে সরে পড়েছে, এমন কি ওদের নবী ঈসা (আ.)-এর প্রদর্শিত পথেও নেই ওরা। ওরা আছে সেন্ট পলের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ খ্রীস্টবাদের ওপর। মূল ধর্ম-দীক্ষা হতে ওরা আজ দূর–সুদূরে। এটা আসলে এক গভীর ষড়যন্ত্রের দরুন হয়েছে। সম্ভবত ধর্মীয় সাজশের মধ্যে এই সাজশই সবচে' বেশী কার্যকরী হয়েছে। সেন্ট পল সফল হয়েছেন ঈসায়ী ধর্মের বিকৃতি সাধনে। অধুনা কেউ ক্যাথলিক হোক কিংবা প্রোটেস্ট্যান্ট, সকলেই সেন্ট পলের অনুসারী। তিনি যে নয়া খ্রীস্টবাদের উদ্‌গাতা-বর্তমান সকলেই তার গোলাম। এজন্য ওরা ইব্রাহীমের যোগ্য অনুসারী নয়। ইকবালের কণ্ঠ এখানে এসে প্রতিবাদদীপ্ত হয়েছে ঃ

'তুমি হেরেমের মিস্ত্রী, তোমাকে নয়া দুনিয়া গড়তে হবে। শুধু হেরেমের মিস্ত্রী নতুন দুনিয়া গড়ার অধিকার রাখে। জগতে আনাড়ী মিস্ত্রী বহু পাওয়া যাবে। বস্তুত এরা ইমারত গড়তে নয়, ভাংতে পটু। তুমি যে পয়গামের বাহক,

যে আসমানী কিতাবের ধারক, যে নবীর উম্মত, সেই নবীর চিন্তাধারা হচ্ছে গোটা বিশ্বকে বস্তুবাদের পূজা থেকে মানুষকে এক আল্লাহর পূজায় নিয়ে আসা। এক্ষণে আমেরিকার নগ্ন তামাদ্দুন তোমার মাঝে জেঁকে বসতে পারে। তাই সাবধান থেকো।'

تبان رنگ ءِخون کو ٹرژکر ملت میں گم هوجا
نه تزرانی رهی باقی نه ایرانی نه افغانی

'তাবানী রং ও খুনের নেশা পরিত্যাগ করে ধর্মপাশে আবদ্ধ হও,
না তুরানী, না ইরানী, না আফগানী (বরং তুমি মুসলিম)।'

তুমি মিসরী বা সিরীয় নও। তুমি একজন মুসলমান। তুমি মুসলিম উম্মাহ। উম্মতে মুহাম্মদী, উম্মতে ইব্রাহীমী। তুমি আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্ন জাতির সন্তান। অটোমোবাইলের দোকানে পার্টস ফিটিংয়ের তুচ্ছ কাজে নিজেকে লিপ্ত করো না। তুমি পেটপূজারী নও। তুমি মজলুম মানবতাকে পয়গামে হক শোনাবে। অলসতার ঘোরে নিমগ্ন জাতির ঘুম ভাঙ্গাবে। ওদের সিল-আঁটা কানে ঝংকার তুলে বলবে ঃ

"তোমরা জীবনের ভুল রাস্তায় বিচরণ করছ। জীবনের কোন্ আস্বাদনটা তোমরা পেয়েছ? তোমাদের জীবন উদ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত; নীড়হারা পাখির মত তোমাদের বিচরণ। চল 'যেদিকে মন চায় সেদিকে'। এটা আত্মহত্যা ছাড়া কিছু নয়। সত্য সুন্দর পথ হতে তোমরা পদস্খলিত। হিন্দু যোগীদের মত লাগামহীন এ জীবন ছাড়ো! বৈরাগ্যবাদে শান্তি নেই।"

আপনি কখনো এলাহাবাদের কুম্ভ মেলায় এলে দেখতে পাবেন, এখানকার শিক্ষিত লোকজন আমেরিকার হায়েনাদের মত বিচরণ করছে। হাঁটু গেড়ে বসছে সাধু-পুরোহিতদের সামনে। হয়ে পড়ছে মন্ত্রমুগ্ধ। ঠিক যেন জিনে ধরা রোগী এক একজন! সংস্কৃতির শরাব পানে ওরা বুঁদ হয়ে আছে। পাশবিক জীবনে প্রত্যাবর্তন, কুদরতী অনুদানের অস্বীকার, আত্মীয়তা সম্পর্ক ছেদন ও সত্য সুন্দর জীবন হতে পশ্চাৎগামী হয়ে ওরা স্বস্তির ঢেঁকুর তুলছে। হায়! ইসলামী চিন্তাবিদগণ যদি ওদের সৎ পথে আনয়নের সদিচ্ছা পোষণ করতেন! মুসলিম রাজা-বাদশাহগণ এগিয়ে আসতেন! আহা! তারা যদি পথহারা আমেরিকাবাসীদের পথ নির্দেশ দিতেন, তাহলে আমেরিকাকে আজ এ নাযুক পরিস্থিতির শিকার হতে হতো না।

হায়রে কপাল! ইসলামী সাম্রাজ্যের কুলীন রাজা-বাদশাহগণ কেউই ওদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে সাহস পান না। পারেন না ওদের বিবেকের রুদ্ধ কপাটে আঘাত করতে। শুধু সমালোচনাই করেন তারা।

পাশ্চাত্যের পর্যটকরা নেপালের নৈসর্গিক পর্বতশৃঙ্গে এসে মদ গিলে মাতাল হয়ে থাকে। মুসলমান জাতি একটু সচেতন হলে ওদেরকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারত। সচেতন অলী-আউলিয়াদের এদিকটির প্রতি লক্ষ্য দেয়া ঠিক নয় কি? পৃথিবীর এই প্রান্তে বসবাসরত পথহারা জাতির কানে আজ ঢুকিয়ে দেয়া প্রয়োজন ঃ

الا بذكر الله تطمئن القلوب -

"প্রকৃত স্বস্তি আল্লাহর জিকিরের মাঝেই নিহিত।" এসব ধর্মীয় কথা শোনানোর জিম্মাদারী ছিল মুসলিমদের। কিন্তু কোথা সে মুসলমান? মুসলিম বিশ্বে এমন কোন দেশ আছে কি, যে আমেরিকানদের কানে এ কথার ঝংকার তুলবে?

খোদ মুসলিম জাতির-ই এর প্রতি নিরঙ্কুশ বিশ্বাস নেই। কি করে তারা অন্যকে এর সবক দেবে? নামায ও তার ঐশী ছোঁয়ায় যাদের আকীদা দোদুল্যমান, কালেমার সততায় যারা সন্দিহান, তাকদীর যাদের কাছে হাস্যস্পদ, আমেরিকাকে যারা রুটি-রুজির স্বর্গরাজ্য মনে করে, কল-কারখানাকে যারা খাদ্য দেবতা ভাবেন, তারা কি করে অন্যকে তৌহিদের মর্মবাণী শোনাবে? কোন্ মুখে তারা বলবে ঃ

لا رازق الا الله "অন্নদাতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই"

সুধীমণ্ডলি! আপনারা আপনাদের ঈমান-আমলকে মযবুত করুন। নামাযের পাবন্দি করুন। কিছুক্ষণ মুরাকাবায় বসে আল্লাহকে স্মরণ করুন। তারপর জ্বালিয়ে দিন মেশিনের ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন মানবের আলোহীন হৃদয়ে প্রভুপ্রেমের প্রদীপ্ত শিখা। পুড়িয়ে ছাই করে দিন শয়তানী রূহ্! স্থির করুন আপনার জীবনের লক্ষ্য। কুরআনের গবেষণা করুন। সীরাতুন্নবী (সা.) পড়ুন। গড়ে তুলুন এর আলোকে আপনার জীবন। সচেষ্ট হোন অন্যের জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাতে। এরপর পৌঁছে দিন আমেরিকাবাসীদের মনে সত্য সুন্দর চিরন্তন ধর্মের পয়গাম।

ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম

ইসলাম সত্য ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলাম বাস্তবের মুখোমুখী। বাস্তবকে গলা টিপে মারার মত নয় এ ধর্ম। ইসলামের অজেয় শিক্ষা অনস্বীকার্য। ইরশাদ হয়েছে ঃ

فطرت الله التى فطر الناس عليها -

আল্লাহ্ তা'আলা সত্য-স্বাভাবিক ধর্মের ওপর মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে সাদাসিধে করে বানিয়েছেন। নিষ্পাপ প্রবৃত্তি দিয়েছেন, কল্যাণমুখী করেছেন, আমরাই সেই কল্যাণের দরজা নিজ হাতে

বন্ধ করেছি। মানুষ জন্মগতভাবেই নেককার ও হকপন্থী। তাকে সত্যের পয়গাম দিলে সে সহজেই গ্রহণ করবে। এজন্য আপনাকে চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। তনু-মন দু'টোই ব্যয় করতে হবে। এরপর দাওয়াত দিতে হবে। তুমি উম্মতের দাঈ (দিশারী), উম্মতে রেসালাত, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে বদ্ধপরিকর। জাতির কর্ণধার। জাতির সুখ-দুঃখের সাথী। তুমি ভোগবাদী হয়ো না। হয়ো না খেয়ে দেয়ে পেট ভরা অধিক প্রজননশীল প্রাণী।

উদাত্ত আহ্বান

আমরা মনের কথাগুলো আপনাদের জানিয়ে দিলাম। আমেরিকায় সব কিছু দেখলাম, কিন্তু খুঁজে পেলাম না মনের মত একজন মানুষ। প্রকৃত মানুষ দেখলে আপনাদের দেখেছি। আমেরিকা আর আমেরিকাবাসীদের সম্পর্কে আমি পুরোপুরি ওয়াকিফহাল নই। পোস্টার আর টিভির মিনি পর্দায় তাদের দেখেছি। রেডিওর ইথার তরঙ্গে তাদের লোক-লৌকিকতা, জীবনকাল ধারণ করেছি। তাই বলতে গেলে সম্পূর্ণ অপরিচিত নয় এরা। সত্যি বলতে কি, মানব জাতি আল্লাহ্র খলীফা। এদেরকে আল্লাহ্ সৃষ্টির সেরা করেছেন। তামাম দুনিয়ার উৎকর্ষ আর প্রগতি আল্লাহর সন্তুষ্টির সামনে তুচ্ছ।

সেই মহাপ্রাণ মানবের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান! মানবতাকে জাগিয়ে তুলুন, তাহলে আপনার প্রবাস সঠিক ও যথার্থ হবে। আপনার প্রবাস ইবাদত হবে। হবে দাঈ ও মুবাল্লিগের জীবন। আমার আশংকা হয়, আপনার সন্তানকে যদি দ্বীনী তালিম দিতে না পারেন, দিতে না পারেন ঈমান ইসলামের শিক্ষা, তবে এ প্রবাস আপনার জন্য গোনাহের কারণ হবে। নিপতিত হবেন আপনি গভীর সমস্যার আবর্তে।

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰئِكَةُ ظَالِمِىْ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ط قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ط قَالُوْآ اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا -

"জালেমদের রূহ্ কজাকালে ফেরেশ্তাগণ তাদের বলেন, তোমাদের হলো কি? তারা বলে, আমাদের কি করার ছিল? এ রাজ্যে আমাদের কোন শক্তি ছিল না। ফেরেশ্তাগণ বলবেন ঃ আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না? অন্য রাজ্যে হিজরত করতে পারলে না?" (সূরা নিসা আয়াত-৯৭)

এমন স্থানে আমাদের বসবাস করা দরকার যেখানে মানব জাতি স্ববৈশিষ্ট্যে থাকতে পারে। আদায় করতে পারে ইবাদাত। আমেরিকার পরিবেশ অনুকূল না হলে মনে করবেন এখানে আপনার থাকা চলবে না। থাকতে হলে মাথা উঁচু করে

থাকতে হবে। একজন মর্দে মুমিন হিসেবে বাস করতে হবে। পরিবেশ সৃষ্টি করে হালচাল ইসলামী ভাবধারা মোতাবেক চালাতে হবে। বাচ্চাদের সহীহ্ তালীম দিতে হবে। হযরত ইয়াকুব (আ.) সন্তানদের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ماتعبدون من بعدى ط قالوا نعبد الهك و اله اباءك ابراهيم و اسمعيل -

হযরত ইয়াকুব (আ.) ইহধাম ত্যাগের পূর্বে ছেলে-সন্তান ও নাতি-পুতিদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার কলিজার টুকরা সন্তানগণ! মৃত্যুর পূর্বে নিশ্চিত হতে চাই! আমার তিরোধানের পর তোমরা কার ইবাদাত করবে? তারা বললেনঃ আমরা আপনার ও পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম-ইসমাঈলের আল্লাহর ইবাদত করব। ইয়কুব (আ.) নিশ্চিত হলেন। অতঃপর চোখ বুজলেন।

এমনিভাবে আমাদেরও জানতে হবে, নিশ্চিত হতে হবে, সন্তানরা আমাদের মৃত্যুর পর ইসলামের ওপর থাকবে কি না। ওদের ইসলাম ইনজেশনের ওপর সন্দিহান হলে আপনাদের এ প্রবাস কতটা যুক্তিযুক্ত, ভেবে দেখবেন আশা করি।

মুসলিম হয়ে এখানে থাকতে পারেন

আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে এম. এস.-আই. এর সেবামূলক কার্যক্রমকে স্মরণ করছি। তারা আমেরিকা সমাজে দ্বীনের কতটুকু খেদমতের আঞ্জাম দিচ্ছেন, তার পুরোপুরি বিবরণ এখন যদিও আমার কাছে নেই, তথাপিও সম্যক যা দেখলাম, তাতে অন্তর থেকে দু'আ আসছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের শ্রম-সাধনা কবুল করুন! বাড়িয়ে দিন তাদের মর্যাদা! তবে আপনারা সর্বদা একটি কথা খেয়াল রাখবেন, আমেরিকায় থাকতে হলে মুসলিম হিসেবেই থাকতে হবে। মোম আর তুষারের মত বিগলিত হওয়া যাবে না।

নগ্ন সভ্যতার সেবাদাস হওয়া যাবে না। হলে, যেখান থেকে এসেছেন, সেখানে চলে যাওয়াই শ্রেয়। স্বদেশে আয়-রোজগার এখানকার চেয়ে কম হলেও ইসলামী জিন্দেগী যাপন করে ওখানে মরা ভাল। আপনি এদেশে থাকবেন। দ্বীনী দায়িত্ব পালন করবেন। আপনার দ্বারা বিদূরীত হবে এক আলোর ঝলকানি যদ্দারা পথহারা আমেরিকাবাসী খুঁজে পাবে ইসলামের সুমহান রাস্তা।

এ দেশ ও জনগণের জন্য প্রয়োজন আসমানী শিক্ষার

[১৯৭৭ সালের ২৫ শে জুন ইসলামিক সেন্টার ওয়াশিংটন কর্তৃক আয়োজিত কনফারেন্সে প্রদত্ত ভাষণ। অনুষ্ঠানের এন্তেজামিয়া কমিটি প্রধান মাজহার হুসাইন পরিচয়পর্ব সম্পাদন করেন। উক্ত কনফারেন্সে ভারত, পাকিস্তান, আরবের শিক্ষানবীশ ও মডেল সিটি ওয়াশিংটনে বসবাসরত মুসলিম নর-নারীরা উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে জনৈক মিশরী ক্বারী সূরা কাহাফের ঃ

و اضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين -

আপনি তাদের কাছে দু' ব্যক্তির উদাহরণ পেশ করুন। আমি তাদের একজনকে দু'টি বাগান দিয়েছি।

এই রুকু তেলাওয়াত করেন। বিদগ্ধ দার্শনিক নদভী সাহেব এই আয়াতকে তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন।]

সমবেত ভাই-বন্ধুগণ!

আমেরিকার মডেল সিটি ওয়াশিংটনে আপনাদের লক্ষ্য করে কিছু বলতে পারায় নিজকে গৌরবান্বিত মনে করছি। এই শহর পুরো দুনিয়ায় তাহজীব-তামাদ্দুন ও পরিপাটিতে গুরুত্ববহ মনে করে। এতদ্সত্ত্বেও আপনাদের ভালো লাগুক, চাই না লাগুক, আমি একটি ঘটনা শোনাচ্ছি।

এখানে কিসের অভাব

আমেরিকা এমন উন্নত হলো কিভাবে? আমেরিকাবাসীদের যোগ্যতা, অনুশীলন, নিয়মানুবর্তিতা, সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টা, মেধাগত বিকাশ সাধন, একতা-সমঝোতা তাদেরকে এই ঈর্ষা করার পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। তারা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কলা-কৌশলে প্রাচ্যের চেয়ে অনেক এগিয়ে গেছে।

জড়বাদী সভ্যতার বস্তুবাদী দর্শনে ধন্য আমেরিকাবাসীরা তাদের দেশকে দুনিয়ার স্বর্গ বানিয়েছে। আগাম মাফ চেয়ে নিচ্ছি একটি কথার জন্য, তা হলো, আপনাদের প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে এদেশে এসেছেন আমেরিকার জৌলুস দেখে নিশ্চয়ই। চুম্বক যেখানে থাক না কেন, লোহার অণু-পরমাণুকে সে আকর্ষণ করবেই, এতে বিচিত্রের কিছু নেই। পিপাসুরা সেখানেই ভীড় জমায় যেখানে ঝর্ণা আছে। আমি আমেরিকার নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে এক সময় প্রত্যাবর্তন করব। এ দেশটি শুরু থেকে শেষ তক আমি সর্বস্থানে ইতোমধ্যেই গিয়েছি। কুরআন-হাদীস পড়ুয়া একজন নগণ্য ছাত্র হিসেবে মনে করতে পারেন আমার এই সফর। আমি দেখেছি আমেরিকায় অনেক কিছু আছে, তবে সব কিছু

নেই। সব কিছু যে নেই তা জানতে পারলাম ক্বারী সাহেবের পঠিত ক্বেরাত থেকে। আল্লাহ্ তা'আলা ক্বারী সাহেবকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, যিনি সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করলেন। তিনি তাঁর তেলাওয়াতে আমাদের বাস্তব চক্ষু খুলে দিয়ে গেলেন, বিশেষ করে আমার বেশ উপকার করেছেন। চিন্তা করছিলাম কি বলব। বলার অনেক কিছু থাকলেও সব তো আর সবখানে বলা যায় না, বিশেষ করে আমেরিকার কেন্দ্রবিন্দুতে বসবাসরত মানুষদেরকে কিছু বলতে গেলে ভেবে-চিন্তে বলতে হয়। হঠাৎ করেই শ্রদ্ধেয় ক্বারী সাহেব আমার ভাবনা জাল ছিন্ন করতে সহায়ক হয়েছেন। মনে করলাম, আধুনিক সভ্যতার দাবীদার মার্কিনীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে শিক্ষা দিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا - وَفَجَّرْنَا خِلٰلَهُمَا نَهَرًا - وَ كَانَ لَهٗ ثَمَرٌ - فَقَالَ لِصَاحِبِهٖ وَ هُوَ يُحَاوِرُهٗۤ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَّاَعَزُّ نَفَرًا -

"উভয় বাগানই ফল দান করে এবং তা থেকে হ্রাস করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি নহর প্রবাহিত করেছি। সে ফল পেল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সঙ্গীকে বলল ঃ আমার ধন-সম্পদ তোমার চেয়ে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী।" [সূরা কাহাফ ঃ ৩৩-৩৪]

আমেরিকার সাথে এ আয়াতের মিল বেশ দেখা যায়। جَنَّتَيْنِ 'বাগান দু'টি' দ্বারা উত্তর-দক্ষিণ আমেরিকা অথবা পূর্ব-পশ্চিম আমেরিকা বুঝতে পারেন। جنتين من الاعناب এখানে কিসের অভাব? কোন্ ধরনের ফল এখানে দুষ্প্রাপ্য? কিসের শূন্যতা এখানে? আল্লাহপ্রদত্ত নেয়ামত সব চেয়ে এখানে পরিদৃশ্যমান। এরপরও এখানে কিসের অভাব? সেই অভাব ও শূন্যতার দিকে এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ঈমানদার সঙ্গীকে লক্ষ্য করে বলছেন ঃ

وَلَوْلَآ اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللّٰهُ ۙ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -

"যদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চাইতে কম দেখ, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন একথা কেন বললে না; আল্লাহ্ যা চান তাই হয়। আল্লাহর দেয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই।" [কাহাফ ঃ ৩৯]

এখানে শুধু "মাশা-আল্লাহু লা কুওআতা ইল্লাবিল্লাহ"র অভাব। ماشاء الله ঐ জিনিস যা মাটিকে স্বর্ণ বানিয়ে দিয়েছে। মাশা-আল্লাহ সেই বাণী যা জড়বাদকে ইবাদত বানিয়ে দিতে পারে। এই 'মাশা-আল্লাহ'ই মানব প্রবৃত্তির দাম্ভিক ঘোড়াকে পরিচালনা করে অনুগত এক শান্ত সুন্দর বাহন বানিয়ে দিতে পারে। এই মাশা-আল্লাহই হলো চাবিকাঠি, যে তালার ওপর রাখুন না কেন একে, তালা খুলে দেবে। পাশ্চাত্য জগতে, জড়বাদী দুনিয়ায় যে জিনিসটির অভাব তা হচ্ছে ঐ মাশা-আল্লাহ। মাশা-আল্লাহ তো কয়েকটি অক্ষরের সমষ্টির নাম কিন্তু জীবনে স্তরে স্তরে এস্তেমাল করছি আমরা। যেমন 'মাশা-আল্লাহ! এ বাড়ি কবে বানালেন? বাস্তবিকপক্ষে মাশা-আল্লাহ শব্দটিতে বেশ বালাগাত (বাগ্মিতা) রয়েছে, সারা দুনিয়া এর মাঝে ঢোকানো সম্ভব। এই মাশা-আল্লাহই জড়বাদ ও বস্তুবাদকে মদদ জোগাচ্ছে, এটাই মানব শক্তিকে পরিচালনা করছে। এই শক্তিকে বিলীন করার জন্য তার যে কেমন সুদূরপ্রসারী সু-কুদরত আছে তা আমাদের জানা নেই। তাই আমরা যত্রতত্র একে ব্যবহার করি। মাশা-আল্লার অর্থ হচ্ছে ঃ জগতে যা কিছু হচ্ছে তার সবই আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছায়ই হচ্ছে, এতে মানুষের কোন কৃতিত্ব নেই, নেই কোন পুণ্য।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তামাম সৃষ্টি জীবের পালনকর্তা।"

اِنَّمَآ اَمْرُهٗۤ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ -

"তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছে করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন।" "হও" তখনই হয়ে যায়।" [সূরা ইয়াসীন ঃ ৮২]

সুতরাং মাশাআল্লাহ ছাড়া জগতে কোন কিছুই হয় না। আজ যদি কেউ আমায় প্রশ্ন করে বলেন ঃ আমেরিকায় সব কিছুই আছে, কুদরতী খাজানা তাদের কাছে ভরপুর।

اسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة -

"আমার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নেয়ামত তোমাদের ওপর পরিপূর্ণ করে দিয়েছি" এই আয়াতের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হচ্ছে আমেরিকার ব্যাপারে।

ياتها رزقها كل مكان -

এর সত্যায়ন হচ্ছে ওদের বেলায়। এই আমেরিকার উৎপাদিত খাদশস্য সব দেশই কম বেশী ভোগ করে। রুজির বৃষ্টি এদেশে মুষলধারে বর্ষিত হয়। পাল্টা প্রশ্ন করে যদি বলিঃ এত কিছু আছে আমেরিকায় মানলাম, এতদ্‌সত্ত্বেও তারা

নিরাপত্তা ও স্বস্তির গ্যারান্টি কেন দিতে পারছে না? দুনিয়াকে কেন সুপথ প্রাপ্তির দিশা দিতে পারছে না তারা? তারা কেবল জড়বাদের মদদ জোগাচ্ছে, জাগতিক জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করার তালিম দিচ্ছে, কিন্তু পরকাল সম্বন্ধে ওদের কোন সমাধান জানা নেই।

আমেরিকার কোন হিতাকাঙ্ক্ষী নেই

আজ আমেরিকা সারা বিশ্বের সাহায্যকারী। অনেকে এদেশকে (নাউযুবিল্লাহ) খাদ্য দেবতা মনে করে, চলমান বিশ্বের অনেক দেশই আমেরিকার ডলার আশীর্বাদে জীবন অতিবাহিত করছে। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত বহু জাতি উন্নতির মুখ দেখছে ঐ আমেরিকা দ্বারা; প্রতিরক্ষা খাত, মেশিনারী, কলকজা থেকে ছোটখাট বস্তু আমেরিকা দিয়ে আসছে অনেকজনকে। এমনও দেশ বিশ্বে খুঁজে পাওয়া যাবে-আমেরিকার মিত্র হবার দরুন যারা শত্রু থেকে মুক্ত, এতদ্‌সত্ত্বেও কেউই আমেরিকার গুণ কীর্তন করছে না। সুযোগ পাওয়া মাত্রই এদেশের সমালোচনা করছে। লিখে কাগজ ভরে ফেলছে আমেরিকাবিদ্বেষী হয়ে। খুঁজে পাওয়া যাবে না তাই এদেশের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি আজ ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউস-এর ছায়াতলে দাঁড়িয়ে সোচ্চার কণ্ঠে জানিয়ে দিচ্ছি ঃ আমেরিকা! তোমার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু নেই।

এ দেশের বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক ও চিন্তাবিদরা কি ভেবে দেখেন, তাদের দেশ পানির মত ডলার খরচ করে পররাজ্যের শূন্য থলি ভরে দিচ্ছে। এদেশটি এত উদারচিত্ত ও রহমদিল হওয়া সত্ত্বেও কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না কেন? তাই বলা যায়, আমেরিকার কোন একনিষ্ঠ বন্ধু নেই। বিশ্ববাসী আমেরিকাকে দু'চোখে দেখতে পারছে না। কিন্তু কেন বিশ্ববাসীর এ অনীহা? হাতেম-হৃদয়ের অধিকারী মোড়লদের অনুদান তাদেরকে মুখলিছ দোস্ত হতে বাধা দিচ্ছে কে? এ প্রশ্নের জবাব আজ খোঁজবার প্রয়োজন। তবে কি আমেরিকা একনিষ্ঠতার সাথে সাহায্য করছে না? স্বার্থপরতার বেড়াজালে বন্দী হয়ে সাহায্য করছে কি?

আপনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেকশনে পড়াশুনা করছেন। আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি সুদূরপ্রসারী। আপনারাই বলুন, এত দান-সদকা শেষে আমেরিকা বিশ্ববাসীর কাছে কি প্রতিদান পেয়েছে? আমেরিকা যদি কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তবে কেউ কি এগিয়ে আসবে তার সাহায্যার্থে? দু' ফোঁটা অশ্রু ফেলবে কি কেউ? আমার তো মনে হয় কেউ ফেলবে না। সকলেই অপেক্ষা করছে কবে আসবে আমেরিকার পতন।

নবী ও তাঁর অনুসারীগণ প্রিয়ভাজন হওয়ার কারণ

নবীগণ মানবতার সাহায্য করেছেন, খেদমত করেছেন, দিয়েছেন জনগণকে খোদায়ী তোহ্‌ফা, ইখলাসের তোহ্‌ফা, দান এবং সাম্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাঁরা। মানুষ মাত্র ভাই ভাই-এর সবক দিয়েছে তাঁরা; তাইতো জাতি ধর্মনির্বিশেষে সকলেই তাঁদের গোলাম হয়ে গেছে। ঐ জাতি তাদের স্বধর্ম জাতীয় কালচার, হাজার বছরের লালিত ঐতিহ্যকে বিদায় জানিয়েছে। মিশরীয়, সিরীয়, ইরাকী জনতা আরবদের বশ্যতা জীবনের পরম সম্পদ বলে মনে করেছে, এমন কি এরা আরবদের ভাষা পর্যন্ত রপ্ত করেছিল। ইংরেজীর বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রাচ্য হয়ে আসছে। প্রাচ্যবাসীরা সাইনবোর্ড ইংরেজী লিখলেও কেউ কিন্তু আজতক আরবীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে বলে শোনা যায়নি। আরবী ভাষা নিপাত যাক বলে কেউ স্লোগান দেয়নি, যেমনটি দিয়েছে ইংরেজীর বেলায়। বাস্তবিকপক্ষে আরবী ভাষাপ্রধান রাষ্ট্রগুলোতে ইসলামী কালচার আরব্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোন বিদ্রোহও হয়নি কখনও। কিন্তু দুনিয়ার কোণে কোণে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে স্লোগান উঠছে। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন পাশ্চাত্যের অপাংক্তেয় পুতিগন্ধময় সভ্যতাকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে প্রাচ্যের সভ্যতা কিংবা স্বদেশীয় কালচার চালু করবে প্রাচ্যবাসী।

আমেরিকা সঠিক আসমানী ধর্ম থেকে বঞ্চিত

আমেরিকায় সব কিছু আছে কিন্তু আসমানী কিতাব ও আসমানী তালীম থেকে তারা বঞ্চিত। একথা অনস্বীকার্য, এ সংসারকে আল্লাহ্ নিজ গুণে পরিচালনা করছেন। আমরা যা কিছু করছি আল্লাহর কুদরত বলে করছি; তাই আমাদের যাবতীয় কাজকর্ম তাঁর মর্জি মোতাবেক করা চাই। আমরা আল্লাহর গোলাম, তাঁর অধীন। রাষ্ট্রে যদি কোন অভাব থাকে তা ঐ জিনিষের অভাবটিই আছে।

جَنَّتَيْنِ مِنْ اَعْنَابْ -

তো আছে, কিন্তু মাশা-আল্লাহ নেই। জান্নাতী ভূ-খণ্ডের মালিক তো কেবল সেই হতে পারে কুরআনে مثل الرجلين এর মধ্য থেকে احد الرجلين। যিনি কমজোর মুমিন, তিনি جنتين من اعناب - এর থেকে নন। তিনি ফলদায়ক বাগান থেকে বঞ্চিত, তবে তিনি একজন মুমিন, আল্লাহ্ তাকে ঈমান নামের অমূল্য সম্পদ দিয়েছেন।

كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اٰتَتْ اُكُلَهَا -

উভয় বাগানে কোন কমতি নেই। বাগানে ফলমূল ভর্তি। যেন উপচে পড়ছে ঝরনার পানি!

অন্য সঙ্গী বলছেন ঃ এগুলো সবই যথার্থ, তবে 'মাশা-আল্লাহ লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা চাই–

لولا اذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله -

যখন তুমি বাগানে কদম রাখো, বলো! 'আল্লাহর শক্তি বলে' এগুলো হচ্ছে সবই আল্লাহর দান। এগুলো সবই তাঁর দ্বীন ও রহমতের বদৌলতে হচ্ছে।

হায়! আমেরিকা যদি ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত হতো!

আমেরিকা কখনও বলছে না, এগুলো আল্লাহর নেয়ামত। কেন তারা বলছে না? এর আলোচনা বিস্তর! ব্যথিত হৃদয় নিয়ে বলছি। এর কারণ অত্যন্ত লজ্জাকর। ব্যথা মনে এজন্য আমেরিকায় ঈমানী চেতনা থাকলে দুনিয়ার নকশা অন্য ধাঁচের হতো, ইতিহাস লেখা হতো অন্য ধারায়, যুদ্ধের দামামা যখন তখন বেজে উঠত না, পারমাণবিক বোমার আশংকায় থাকতে হতো না। লজ্জাকর এজন্য, মুসলিম জাতি ইসলামী দাওয়াত যথাযথভাবে পৌঁছায়নি। মুসলমানদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ ছিল যখন আমেরিকা ছোট্ট শিশুটর মত অস্তিত্বের পৃষ্ঠায় হামাগুড়ি দিচ্ছিল–তখন দাওয়াত কার্য জোরদার করা। আফসোস! তখন মুসলিম মিল্লাত অলসতার ঘুমে বিভোর ছিল। এর পূর্বেও সুযোগ ছিল যা আমরা হাতছাড়া করেছি। দোর্দণ্ড প্রতাপে মুসলিম জাতি যখন স্পেনে মসজিদ না গড়ে ইসলামের পয়গাম অন্ধকার ইউরোপে ছড়িয়ে দিলে কমপক্ষে ইউরোপবাসীর দিল-দেমাগে ইসলাম পৌঁছে যেত। মুবাল্লিগ ও দাঈগণ যদি ইউরোপের অলিতে গলিতে পৌঁছে যেত তবে আজ পরিণতি এমনটি হতো না। কিন্তু আজ তা আর সম্ভব হচ্ছে না। আমি বলতে চাই, এ এক ভাগ্যবিড়ম্বিত জাতির লজ্জাকর উপাখ্যান!

মোদ্দা কথা, যা হবার হয়েছে। এদেশকে নতুন কিছু উপহার দিতে হবে। দিতে হবে নবুয়তের ছোঁয়া ও তার কালজয়ী দীক্ষা। আফসোস! খ্রীস্টবাদ সে চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণ রিক্ততার ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

খ্রীস্টবাদের ব্যর্থতা

শতাব্দীকাল ধরেই খ্রীস্টবাদ তার ধর্মীয় চাহিদা মেটাতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আসছে। খ্রীস্টবাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, খ্রীস্টবাদ নেহায়েত বৈরাগ্যবাদ বিশ্বাস করে আসছে, এমন কি উগ্রতা আর কট্টর মনোভাবাপন্ন হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে। ধর্ম জ্ঞানের বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছে। তাই সর্বকালের ধর্মবিমুখ ইউরোপ-আমেরিকাবাসীদের নতুন করে দেয়ার কিছু নেই খ্রীস্ট ধর্মের। সভ্যতার দাবীদার উগ্র আমেরিকার লোকজন যদি বলে,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -

এরপর তারা বলতে পারে ঃ

ربنا اتنا فى الدنيا حسنة -

অথচ এই শিক্ষা দিতে খ্রীস্টবাদ নারাজ। কেননা জাগতিক জীবনে উন্নয়ন-অগ্রগতিতে তারা বিশ্বাসী নয়, বরং এরা বৈরাগ্যবাদে বিশ্বাসী।

ইসলামই যথার্থ ব্যাপকভিত্তিক ইলমবাহী ধর্মমত

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً -

এর শিক্ষা দিতে অকুণ্ঠ ছিল আপনাদের গর্বিত পূর্বসূরীরা। আজ সময় এসেছে, ইসলামের মননশীল জগৎজোড়া শিক্ষায় আমেরিকাবাসীদের শিক্ষিত করার। ওদেরকে জানিয়ে দিতে হবে হতাশাগ্রস্ত জাতিকে শিক্ষা দিতে ইসলামের বিকল্প নেই। পয়গামে মুহাম্মদী, ঐশী তালীম, ইসলাম বুনিয়াদী দিক নির্দর্শন পেলে বোধ করি আমেরিকায় আল্লাহর রহমত নাযিল হতো। বদলে যেত আমেরিকার ভাগ্য। যুদ্ধভীতি থেকে জগৎবাসী মুক্তি পেত। মনের কোণে জমাট-বাধা ঘৃণার স্তর দূরীভূত হয়ে যেত, শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্তি পেত। এগুলো একমাত্র ইসলামের কালজয়ী শিক্ষার বলে সম্ভব।

খ্রীস্টবাদের বিকৃতি

হাজার দু'য়েক বছর পূর্বে খ্রীস্ট ধর্মের আবির্ভাব হয়। ফিলিস্তীন ভূ-খণ্ডে এর আত্মপ্রকাশ হয়েছিল। যুগটা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের যুগ। অধুনা খ্রীস্টবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে বসে আমি নির্ভীক কণ্ঠে বলছি; এ ধর্ম হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রবর্তিত সেই খাঁটি ধর্ম নয়। তিনি যে ধর্মমতের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিলেন তা ছিল নিছক আল্লাহর ধর্ম, কিন্তু বর্তমানে খ্রীস্টবাদ সেন্ট পলের সৃষ্ট ধর্মমত, এটা তার মন-মস্তিষ্কপ্রসূত মতবাদ। সেন্ট পল মধ্যযুগীয় একজন খ্রীস্টান। সভ্যতার আশীর্বাদধন্য মানবদের জন্য তাই এই বিকৃত ধর্ম কাজে আসছে না। মানবীয় মতবাদ ধর্মীয় মতাদর্শে মিশ্রিত হলে যা হবার তাই হয়েছে। এদের ক্ষেত্রে খ্রীস্ট ধর্মে নেই আদর্শ, নেই শিক্ষণীয় কিছু।

উদাত্ত আহ্বান

হে আমেরিকাবাসি! হে হোয়াইট হাউজে বসে বিশ্ব চালনাকারী দেশ! তোমাদেরকেএজন্য মুবারকবাদ জানাই, ঘৃণার বিষ নযরে দেখছি না এজন্য। শুধু বলতে চাই, তোমরা মাশা-আল্লাহ-লাকুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ্ বসিয়ে নাও প্রতিটি কাজের শুরুতে। আল্লাহর সন্তুষ্টিকল্পে সব কিছু করবে। তোমাদের সব কিছু আল্লাহর জন্যে কর। জড়বাদী উৎকর্ষকে মানবতার মুক্তির জন্য সোপর্দ কর, সমতার কল্যাণের জন্য কর। এমন সমাজ গঠনের প্রয়াস বলো যে সমাজে ধনী-নির্ধন, প্রজা-রাজা, আসামী-জজ সকলে সমান সমান।

তোমরা এমন একটা সমাজ গড়, যে সমাজে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মধ্যে কোন তফাৎ থাকবে না। এমনটি করতে না পারলে এই সভ্য সমাজ মূলত সত্যের নামে অপলাপমাত্র। হোয়াইট হাউজের মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে আমি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করছি, যে তাহজীব মানবতার ধ্বংসস্তূপের ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চায় সে তাহজীব চিরঞ্জীব নয়। আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

وہ فکر گستاخ ھے جس نے عریاں کیاھے فطرت کی طاقتوں کو

اسی کی بیتاب بجلیوں سے خطرہ میں ھے اسکا اشیانہ۔

ঐ ভ্রান্ত চিন্তাধারা যা ধর্মীয় শক্তিকে উলঙ্গ করেছে, তার লাগামহীন জৌলুস সংশয়ে রয়েছে উপকারলোভী ব্যক্তিরা।

আজ বিজ্ঞানের জৌলুস সর্বত্রই, তবে কতদিন থাকে এই জৌলুস কে জানে।

ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দাও

আপনারা ভাগ্যবান জাতি; কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে এমন জৌলুস ও প্রাচুর্য দান করেছেন। আপনারা মানবতার মূল্য দিতে শিখুন। এই আকাশচুম্বী প্রাসাদ চিরদিন থাকবে না তাই পরকালের জন্য নিজেদের তৈরী রাখুন। নিম্নোক্ত আয়াতের মধ্যে আপনাদের কথার উল্লেখ রয়েছে ঃ

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الارض ولا فسادا ط والعاقبة للمتقين۔

"এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনিষ্টতা সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম।"

আপনারা এক মুসলিম ভাইয়ের মুহাব্বতে শরীক হওয়ায় আমি শোকরিয়া জানাই। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের ঈমান আমলের হিফাজত করুন! আপনাদের সন্তানরাও ঈমানী জীবন যাপন করুক!

فلا تموتن الا و انتم مسلمون۔

"তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।" যতদিন তোমরা দুনিয়ার মধ্যে জীবিত থাকবে, প্রভুর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে থাকবে। নামাযের পাবন্দী করবে, কালেমা-কালাম ইয়াদ রাখবে। দুনিয়া থেকে চিরবিদায়কালে যেন ঈমানের নূর থাকে। জবানে যেন জারী তাকে কালেমায়ে শাহাদাত।

আমেরিকা ও কানাডায় বসবাসরত মুসলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

[১৯৭৭ সালের ১০ই জুন টরেন্টো ভার্সিটি (কানাডা)-তে মুসলিম ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে মাওলানার প্রদত্ত ভাষণ।]

"হে ঈমানদারগণ! আমার জমিন সুপ্রশস্ত। তোমরা একমাত্র আমার ইবাদত করো।" [সূরা আনকাবুত ঃ ৫৬]

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

উপস্থিত ভাই ও বোনেরা! পার্থিব জিন্দেগীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগী করা অর্থাৎ আল্লাহর মারেফাত-তার আহকাম মোতাবেক জীবন গঠন, পরকালের তৈরী, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাসূলের (সা.) তরীকা মোতাবেক চলা, আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। এছাড়া অন্য যা কিছু আছে তা সবই আনুষঙ্গিক ও উসিলামাত্র। আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যমে অন্বেষণ করা, জুৎসই পরিবেশ সৃষ্টি করা, শক্তি-সামর্থ্য সাধ্যমত প্রয়োগ করা, যাতে আল্লাহর হুকুমকে সহজে মান্য করা যায়, বাধ্যবাধকতার শিকার না হতে হয় আর বাইরের কোন শক্তির ধ্বজা ধরতে না হয়। কুরআন মজিদ মুজেযানা শব্দে ঘোষণা দিচ্ছে ঃ

حتى لا تكون فتنة۔

"যেন ফেৎনা-ফাসাদের সৃষ্টি না হয়, দুনিয়াতে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়।" আকর্ষণ-বিকর্ষণের সৃষ্টি হলে দু' শক্তির মাঝে টক্কর বাঁধে। দুটি ধর্ম থাকলে মানুষের মাঝে সংশয় থাকে কোন্টা গ্রহণ করবে? কেউ বলবে এদিকে, আবার কেউ ওদিকে।

اطيعوا الله۔

অর্থাৎ অনুকরণ-অনুসরণ শুধু আল্লাহ্ তা'আলারই হবে। এজন্য দাওয়াতের কাজ করতে হবে, করতে হবে সৎ কাজে আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ। পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে জিহাদ করতে হবে। এজন্য এখনই লোকজন তৈরি করতে হবে, যাতে তারা আল্লাহর রাস্তায় চলতে অভ্যস্ত হয়ে যায় নতুবা আকস্মিক জেহাদ হলে নবদীক্ষিত জনতা বলে উঠবে, এটা আমাদের জন্য অসম্ভব।

আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর বন্দেগী

দুনিয়া সৃষ্টি, মানব সৃষ্টির উদ্দেশে হচ্ছে আল্লাহর বন্দেগী করা–

وما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون۔

এক্ষণে সকলে পরিষ্কারভাবে বুঝে নিন! ইউরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষিত লোকজন কেবল উসিলা আর জড়বাদের পেছনে দৌড়ঝাঁপ করেন, মেহনত করেন লোহালক্করের ওপর, ভুলে যান তাঁদের সৃষ্টির রহস্য। আল্লাহ্ তা'আলা একটি জীবনকাল দিয়েছেন, যোগ্যতা দিয়েছেন, এগুলো তাঁর সন্তুষ্টি মোতাবেক ব্যয় করতে হবে, যাতে আখেরাতে তিনি আমাদের ওপর রাজী খুশি থাকেন। আমরা যেন তার নৈকট্য অর্জন করতে পারি। জান্নাতে যেন আমাদের উঁচু মাকাম অর্জন হয়-এটাই তো সৃষ্টির মূল রহস্য! আপনারা যদি এ কাজ করে থাকেন তো আপনাদের প্রবাস জীবন ধন্য। এ কাজ মাতৃভূমিতে করতে বাধার সম্মুখীন হলে ঐ মাতৃভূমি ত্যাগ করতে হবে। মাতৃভূমি ঐ স্থানকে বলে যেখানে মানুষ জন্মগ্রহণ করে যেখানের কাঁটা ও ফুলের চেয়ে প্রিয় হয়। কবির ভাষায় "জন্মভূমির কাঁটার ছোবলও রায়হান ফুলের চেয়ে সুগন্ধময়।"

জন্মভূমির মাটি মুক্তোর চেয়ে দামী, মানুষ একে চোখের সুরমা বানায়, এমন স্থান যেখানে মানুষ ভালবাসার নীড় রচনা করে, পিতামাতার উপস্থিতি, ভাইবোন ও বংশের লোকজনের কোলাহলে মুখর থাকে, মোটকথা জন্মভূমির সাথে মানবের সম্পর্ক নাড়ীর সম্পর্ক। আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্পর্কে কুরআন পাকে ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ٰاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ -

"বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাবার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা.) ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয় তবে অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ্ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" [সূরা তাওবাহ ঃ ২৪]

হুযূর (সা.)-এর হিজরত

মক্কা মুকাররমা এমন এক পূত-পবিত্র ভূ-খণ্ড যা হযরত ইব্রাহীম (আ.) দোয়ার ফসল, অতি প্রিয় এ ভূমি। কুরআনে এসেছে–

فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم -

"হে আল্লাহ! মানুষের অন্তরকে এর দিকে এমনটি করে দাও যেমনটি লোহা চুম্বকের দিকে।"

এ প্রিয়ভূমি পবিত্র হরমে মক্কা। এখানে বায়তুল্লাহ আছে। আছে জমজম, সাফা-মারওয়া, মীনা-আরাফাত। রাসূল (সা.) যখন দেখলেন এখানে ইবাদত-বন্দেগী করা মুশকিল তখন তিনি সাহাবাদের একটি দলকে হাবশায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। এ নির্দেশ কেন দেয়া হলো? নিশ্চয়ই এখানে স্বাধীনভাবে ইবাদত করা যাচ্ছিল না। হাবশায় গেলে স্বাধীনভাবে ইবাদত করা যাবে, পড়া যাবে নামায। এভাবে দু'বার হাবশায় হিজরত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে হিজরত করার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ যাও, মক্কা ছেড়ে মদীনায় চলে যাও। আল্লাহর ইবাদাত স্বাধীনভাবে কর। ইবাদাতে বিঘ্ন ঘটার দরুন মক্কা ছাড়ার নির্দেশ এলে বিশ্বের অপরাপর শহরের অবস্থা কি দাঁড়াতে পারে? অন্যান্য শহরে যদি ইবাদাতের বিঘ্ন সৃষ্টি হয় তাহলে তা ছাড়তে হবে, চাই তা নিউ ইর্য়ক, কর্ডোভা, গ্রানাডা, কায়রো বা দামেস্ক শহর হোক না কেন! মোটকথা আল্লাহর ইবাদাত যেখানে স্বাধীনভাবে করা যায় সেটাই প্রিয় দেশ। এছাড়া যেখানে তা সম্ভব নয় তা অপ্রিয় দেশ-পরিত্যাজ্য দেশ। চাই তা যতই মনোমুগ্ধকর মডেল সিটি হোক না কেন।

তৃপ্তি ও অতৃপ্তি

যুক্তরাষ্ট্রে এসে আমি বহু শহর প্রদক্ষিণ করেছি। সেই পরম্পরায় আজ কানাডার এই শহরে উপনীত হয়েছি। বিভিন্ন দেশের মুসলিমদের এখানে দেখে একদিকে যারপর নেই আনন্দিত হয়েছি। কেননা মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম হলো সমজাতীয় লোকদের সাথে সাক্ষাত হলে পরিতৃপ্তি লাভ হওয়া। অন্যদিকে অজানা আশংকায় দিল মন কেঁপে ওঠে এই ভেবে, এখানে ইসলামী শরীয়া মোতাবেক জীবন যাপন সম্ভবপর কি? আগামী প্রজন্ম তথা আপনার সন্তান-সন্ততি কি ইসলামের ওপর থাকবে? আপনাদের মাঝে ইসলামের যে চেতনা আছে তা কি থাকবে ওদের মাঝে? একথা ভাবার প্রয়োজন কি আমার একার–না আপনাদেরও দরকার আছে? আপনারা কিছু মনে না করলে একটি কথা বলি, অধিকাংশ লোকই এখানে স্বার্থের জন্য এসেছে। এসেছে ডলার কামাই করতে। উপার্জন কোন হারাম জিনিষ নয়, কোন গোনাহের বস্তু নয়, কিন্তু যেখানে জড়বাদী ধ্যান-ধারণা প্রবল, সে সমাজে বসবাস করা কতটুকু সঠিক তা জ্ঞানীমাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন। আপনাদের এ প্রবাসে যদি দ্বীনের সামান্যতম উপকার হয়, ঈমান-আমলও সঠিক থাকবে এমনটি যদি দৃঢ়মূল থাকে, আপনাদের তাহলে তো কোন ক্ষতি নেই। হতে পারে এ ভূ-খণ্ডে একদিন ইসলামের পতাকা উড়বে আপনাদের উসিলায়।

আরবের বাণিজ্য জাহাজগুলো যখন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে নোঙ্গর ফেলছিল তখন হাজারো বে-দ্বীন ইসলামে দীক্ষিত হয়। আজ মুসলমান সংখ্যাধিক্যের দিক দিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী। ইতিহাসের ধূসর পাতাগুলো উল্টালে দেখতে পাবেন ইসলাম প্রচারিত হয়েছে সিংহভাগই আরব্য বাণিজ্য কাফেলার সহযাত্রী দ্বারা। এরপর সূফী ও দরবেশ দ্বারা। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের বেশ ক'টি প্রদেশে ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সূফীদের দ্বারা। যেমন, সিন্ধু, কাশ্মীর, বাংলাদেশ প্রভৃতি।

সুধীবৃন্দ! আপনারা যদি ঈমান-আমল ঠিক রেখে সন্তানদের ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালনা করতে পারেন, আপনাদের সৃজনশীল সভ্য জীবন যাপন দেখে বিধর্মীদের মাঝে অনুরাগের সৃষ্টি হলে এ প্রবাস আপনাদের জন্য শুধু বৈধই নয়, বরং জেহাদের পর্যায়ভুক্ত হবে বলে আমি মনে করি। পক্ষান্তরে আপনারা যদি নিছক ভোগবিলাসে মত্ত থাকেন তবে এ জীবন ব্যবস্থার সাথে শরীয়তের কোনই যোগ্যসূত্র নেই।

আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, বিশ্বাস না হলে মুসলিম মনীষীদের কাছে এ কথার সত্যতা যাচাই করে নিতে পারেন। আমি যা আরজ করলাম তা ইসলামী শরীয়া মোতাবেক হলে আপনাদের প্রবাস জীবন যায়েজই নয়, বরং একটি ইবাদাত হবে। আল্লাহ্ না করুক, আপনার সন্তানরা পাশ্চাত্যের চাকচিক্যে প্রভাবিত হয়ে পথহারা হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে কি জবাব দেবেন? হালুয়া-রুটির অন্বেষায় এসে ঈমানের মত দুর্লভ নেয়ামত খুইয়ে বসা জ্ঞানী লোকের পরিচয় নয়। অবশ্য যে কথা আগেও বলেছি, আপনারা এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন যে পরিবেশে আপনার ঈমানে আঁচড়টুকু লাগবে না। আপনি উপার্জনের সাথে সাথে দ্বীন প্রচারের জন্য একটা দাওয়াতী দলের সাথে সম্পর্ক রাখলেন, আখেরাতে চিন্তা করলেন, এমন একটি সুন্দর পরিবেশ গড়লেন, যা দেখে আকর্ষিত হয় বিধর্মীরা, শিশুদেরকে দ্বীনী তালীম দিলেন, এর মত প্রশংসনীয় কাজ আর হতে পারে না। এমনটি না হলে কিয়ামতের দিন শিশুদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় ঃ তোমরা আমার নাম জান না, জান না আমার রাসূলের নাম, জান না নামাজ, তবে দুনিয়ার থেকে কি নিয়ে এলে? তখন তারা বলবে ঃ

اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا -

"হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম। অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল।" [সূরা আহ্যাব ঃ ৬৭]

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا -

"হে ঈমানদারেরা! তোমরা নিজকে ও পরিবারকে (সন্তান) জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।" [সূরা আত-তাহ্‌রিম ঃ ৬]

আপনার শিশুরা স্কুলে যায় ভালো কথা, কিন্তু তৌহিদ-রেসালাত ও দ্বীনের তালীম দেয়ার কোন একটা সময় নির্ধারণ করেছেন কি? যা ছাড়া মানুষ মুসলমান হতে পারে না তা শিক্ষা দেয়া হয়েছে আদৌ?

মনে রাখবেন! দ্বীনী তালীম ছাড়া মুসলিম শিশু বাচ্চার মৃত্যু শ্রেয়। এ ধরনের স্পষ্ট কথা বলায় বেয়াদবী হলে আমায় মাফ করবেন। আপনারা চব্বিশ ঘণ্টার এক ঘণ্টা যদি দ্বীনী তালীমের জন্য নির্ধারিত করেন, তবে আমি বলতে পারি পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে কানাডায় টেনে নিয়ে এসেছেন। পাক-ভারতসহ এশিয়া মহাদেশীয় রাষ্ট্রের যুবকশ্রেণী বাঁধভাঙ্গা বন্যার ন্যায় পাশ্চাত্যমুখী হচ্ছে হালুয়া-রুটির লোভে।

দৃষ্টান্তমূলক কিছু ঘটনা

আমি শুধু ঐসব লোকের এদেশে বসবাস করাকে বৈধ মনে করছি যারা ঈমান-আমালী পরিবেশ গড়ে বিধর্মীদের আকর্ষণ করতে পারে নতুবা এখানে কোন মুসলমানদের ইন্তেকাল হলে শরীয়া মোতাবেক তার কাফন-দাফন হবে কিনা এ গ্যারান্টিটুকু নেই। কানাডার বোস্টন শহরের বসবাসকারী আমার প্রিয়ভাজন মৌলভী মুদাসসির সাহেব বলেছেন ঃ এখানে জনৈক হাজী সাহেবের ইন্তেকাল হয়। ফোনে খবর এল, দাফনে অংশ গ্রহণ করতে হবে। এখানে এসে দেখলাম লাশ বাক্সবন্দী, স্যুট-কোট পরিধান করানো হয়েছে, লাগানো হয়েছে টাই, আংগুলে সোনার আংটি, খ্রীস্টান নারী-পুরুষ আসছে আর চুমু খাচ্ছে আর কফিনের ওপর ফুল-পাপড়ি বিছাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা মৌলভী সাহেবের হায়াত দারাজ করুন! তিনি শেষ জীবনে মাদ্রাসায় পড়েছিলেন। তিনি পরিস্থিতি দেখে শিউরে উঠে হাজী সাহেবের ছেলেকে বললেন ঃ আমি চলে যাচ্ছি।

তারা বলল ঃ কেন?

মৌলভী বললেন, আমি যা কিছু বলব, আপনারা তা তো করবেন না।

আরে মৌলভী সাহেব! আমরা আপনাকে ডেকে পাঠালাম আর আপনার কথা মানব না? এগুলো কি বলছেন আপনি?

মুদাসসির সাহেব বলেনঃ প্রথমে তাঁর (মরহুম হাজী সাহেব) স্যুট-কোট খুলে ফেলুন। সমবেত লোকদের সরিয়ে দিন। আমি শরীয়া মোতাবেক গোসল দেব, কাফন পরাব। সোনার আংটি খুলে নিন।

সোনার আংটি না খুললে হয় না? নতুবা আম্মা হার্টফেল করবেন।

আমি অবশ্যই সোনার আংটি খুলব। আপনার আম্মার হার্টফেলের আশংকা থাকলে তাকে এখন জানাবেন না। শেষ পর্যন্ত সে রাজী হয়ে যায়।

ভাগ্যিস! আমার স্নেহভাজন মৌলভী মোদাসসির সাহেব সেখানে পৌঁছেছিলেন। না জানি কত মুসলমানের কানাডায় এভাবে খ্রীস্টান স্টাইলে দাফন হচ্ছে।

দ্বিতীয় ঘটনা

একদা কানাডায় এক মিশরীয় আলেমের মৃত্যু হয়। তিনি জীবদ্দশায় ইংরেজীতে একটি ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন বই রেখেছিলেন। এদিকে তার স্ত্রী ছিল আমেরিকান। দূরে ছিল মুসলিম কবরস্থান, তাই স্ত্রী তার স্বামীকে খ্রীস্টান কবরস্থানে দাফন করবে। এ দৃশ্য জনৈক মুসলমান স্বপ্নে দেখে চিৎকার করে ওঠেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি বাঁচাও, তাঁকে সংরক্ষণ করো। এ ঘটনা দুটো শোনার পরও কি আমাদের হুঁশ আসবে না?

উপসংহার

সুধীজন! আপনারা একটু চিন্তা করুন। শিশুদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করুন নতুবা এখানে দু'টি দুশ্চিন্তায় পড়বেন। প্রথমত আপনি নিজে, দ্বিতীয়ত আপনার দেশ। পাক-ভারতের যে যুবকশ্রেণী এদেশে এসেছেন, তারা মাতৃভূমিতে ১০/১২ জন লোকের অধীনে কাজ করতেন। তার একটি শক্তি ছিল, পিতামাতা আশেপাশে ছিলেন। আরবের বহু লোক এখানে আছেন। তারা আপনার দেশে থাকলে নিজেরা শক্তিশালী বানাতেন অন্যকে। নিজ যোগ্যতা বলে অন্যের উপকার সাধন করতেন। শুধু পার্থিব হালুয়া-রুটি, একটি সুখের নীড়, অভিজাত পোশাক-আশাকের আশায় এই নির্জন প্রবাসী জীবন কাটানো কি আপনাদের জন্য ঠিক হচ্ছে? আপনারা হয়তো আমার থেকে এমন কথা চাচ্ছিলেন যা আপনাদের মনমত হয়। কিন্তু আমি আপনাদের অন্তরে কষ্ট দিলাম। জ্ঞানী ব্যক্তিরা একটু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে কথাগুলো ভেবে দেখবেন বলে আশা রাখি।

মুসলমানদের অবস্থান ও করণীয়

[নিম্নোক্ত ভাষণ ১৯৭৭ সালের ৩রা জুন নিউ ইয়র্কস্থ জাতিসংঘের সদর দপ্তরের এক হলরুমে জুম'আর নামাযের খুৎবার তরজমা। ঐ নামাযে আরব বিশ্বের বিভিন্ন সেবা সংস্থার অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন। আরব দেশের লোকজন ওদিন বেশী ছিলেন। রাবেতা আলমে ইসলামী ও জাতি সংঘের অনেক কর্মকর্তাও শরীক ছিলেন। বাদ নামাজ খুৎবার ইংরেজী তরজমা করেন মোজাম্মেল হোসেন সিদ্দীকী।]

আল্লাহর হামদ ও ছানার পর মাওলানা বলেনঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেনঃ

وَلاَ تَهِنُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

"তোমরা ভয় পেও না, চিন্তিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।" [সূরা আল-ইমরান ঃ ১৩৯]

এ আয়াত ঠিক তখনই নাযিল হয় যখন ইসলাম ছোট্ট শিশুটির মত ছিল, ছিল না ইসলামের কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা, ইসলাম ছিল কেবল আরব উপদ্বীপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আরবী ভাষাভাষী লোকজন দারুণ দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত থেকে কালাতিপাত করত। খেজুর, উটের গোশত আর যবের রুটি তাদের প্রধান খাদ্য ছিল। মোটাসোটা পোশাক পরত তারা। ঘর-বাড়ী কাঁচা মাটি ও কাঁচা ইট দ্বারা নির্মিত ছিল। অনেকে তাঁবুর মধ্যে যাযাবরী জীবন যাপন করত।

শীতকালের শৈত্য প্রবাহে আর নিশিথে হাড়কাঁপানো ঠক ঠক অবস্থায় জড়োসড়ো হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকা বকরীর মত তাদের জীবন ছিল। বিধ্বস্ত এই জাতিকে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করে সভ্যতার পথ দেখিয়েছিল মুক্তির মহাসনদ আল-কুরআন। তাদের সাবেক অবস্থা কুরআনে কারীমে এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে ঃ

واذكروا اذ نتم قليل مستضعفون فى الارض تخافون ...

"আর স্মরণ কর সে সময়ের কথা যখন তোমরা সংখ্যালঘু ছিলে, ছিলে ভূ-পৃষ্ঠের দুর্বল জাতি। ছিলে ভীত-সন্ত্রস্ত, তোমাদের না অন্যে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।" [সূরা আনফাল ঃ ২৬]

আরবদের অবস্থা যখন এমন নাযুক ছিল তখন ধন-ধ্যানে প্রভাব-প্রতিপত্তিতে রোম-পারস্য গোটা বিশ্বের মোড়লে পরিণত হয়েছিল। এরা তাহজীব-তামাদ্দুনের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছেছিল। মানবতা তাদের হাতের মুঠোয়

বন্দী ছিল। বিশ্বকে ওরা ভাগাভাগি করে শাসন করত। প্রাচ্যের দেশগুলো পারস্যের কজায় ছিল আর প্রতীচ্য ছিল রোমাকদের দখলে। দুনিয়ার সচ্ছলতা ও প্রাচুর্য তাদের কাছে নত হয়ে যেন ধরা দিয়েছিল! খাদ্যের প্রয়োজন ছিল প্রচুর। অন্যান্য জাতি এদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। চলত ওদের ইশারায়। তাদের হাত মাটিতে পড়লে মাটি সোনা হয়ে যেত। মোটকথা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সব রাষ্ট্র তাদের গুণকীর্তন করত।

আরব জাতির এই দৈন্যের কালে যখন হতাশার বাঁকে ঘুরপাক খাচ্ছিল দুনিয়ার নেতৃত্বে ও মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো থেকে তারা হতাশ হয়েছিল, এমতাবস্থায় কুরআন তাদেরকে সোৎসাহ দিয়েছে। মুসলিমদেরকে উদ্দীপিত করতে কুরআনের আয়াত এভাবে অবতীর্ণ হয়েছে ঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

"তোমরা ভয় পেও না, চিন্তিত হয়ো না, তোমারাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও।" [আল-ইমরান ঃ ১৩৯]

এ সেই কুরআন যা মক্কার কুরাইশদের চ্যালেঞ্জ করেছে, রোম-পারস্যকে চ্যালেঞ্জ করেছে। এই মুষ্টিমেয় মুসলিম জনতার নেতা ও প্রেরিত রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-কে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সূরা ইউসুফ নাযিল হয়েছে।

কুরআন ঘোষণা করছে ঃ

لَقَدْ كَانَ فِيْ يُوْسُفَ وَاِخْوَتِهٖٓ اٰيٰتٌ لِّلسَّآئِلِيْنَ -

"অবশ্য ইউসুফ ও তার ভাইদের কাহিনীতে জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।" [সূরা ইউসূফ ঃ ৭]

এই সূরার সমাপ্তি টানা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে ঃ

حَتّٰٓى اِذَا اسْتَايْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ۭ وَلَا يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ - لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ۭ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ -

"এমন কি যখন আম্বিয়াগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমন কি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছে। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না। তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্বেকার কালামের সমর্থন এবং প্রতিটি বস্তুর বিবরণ ও হেদায়েত।" [সূরা ইউসূফ ঃ ১১০-১১১]

এমনিভাবে সূরা কাসাসের এই আওয়াজ মহাশূন্যে গুঞ্জরণ করে ফিরত। আল্লাহ্ তা'আলার এই সূরায় জুলুম, অন্যায় ও স্বৈরাচারের কাহিনীর বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে ঃ

طٰسٓمّٓ - تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ - نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ - اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَ هُمْ وَيَسْتَحْيٖ نِسَآءَ هُمْ............

"ত্ব-সীন-মীম। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি আপনার কাছে মূসা ও ফেরআউনের বৃত্তান্ত সত্য সহকারে বর্ণনা করছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য। ফেরাউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী। দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল, আমার ইচ্ছে হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার। তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকার প্রদান করার এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্য বাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত।" [সূরা কাছাছ-১, আয়াত ঃ ৬]

এ ধরনের সংশয় ও নাযুক পরিস্থিতিতে কোন মঙ্গলের আশা-ভরসা করা যায় কি? সে কোন্ হৃদয় ও দুঃসাহসী বুকের পাটা যা এ ধরনের ভাগ্য বিড়ম্বিত জাতিকে ইতিহাসের আলোকোজ্জ্বল রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করাতে ভবিষ্যদ্বাণী করে? দুনিয়ার যত বড় গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক হোক না কেন, হোক না সে অভিজ্ঞতা আর যোগ্যতা বলে জগদ্বিখ্যাত, তার পক্ষে থোড়াই সম্ভব এমন একটি মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু জাতিকে সোৎসাহ প্রদান করে কুরআনের মত চিরন্তন নীতিবাক্য শোনানো?

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

সত্যি বলতে কি, কালজয়ী বিশ্বাস ও দৃঢ়চেতা মন-মস্তিষ্কসম্পন্ন আরব জাতি ছিল নিবেদিতপ্রাণ বীর বাহাদুর। বিশাল সাম্রাজ্যবাদীদের তারা দেখত অতি তুচ্ছ। প্রভাব-প্রতাপশালী শক্তিকে তারা খুঁটিহীন ঘর আর ভিত্হীন দালানের মত দেখত। কুরআনে কারীমে এই নিষ্প্রাণ হুকুমাত-এর চিত্র খুব প্রাঞ্জলভাবে চিত্রিত করেছে। আর কুরআনের চেয়ে কেউ বাস্তব চিত্র অংকনকারী আছে কি?

وَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ.وَاِنْ يَّقُوْ لُوْاتَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ - كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ -

"আপনি যখন তাদেরকে দেখেন তখন তাদের দেহাবয়ব আপনার কাছে প্রীতিকর মনে হয়। আর যদি তারা কথা বলে, তবে আপনি তাদের কথা শোনেন। তার প্রাচীরে ঠেকানো কাঠসদৃশ।" [সূরা মুনাফিকুন ঃ ৪]

এ দুর্বল, নিঃস্ব আরব জাতি যখন ঈমানী দৌলত শুনতে থাকেন তখন তারা গৌরবাতিশয্যে আরব উপদ্বীপ থেকে ভিন্ন দেশে বের হন এবং তারা জাগতিক শক্তিতে দাপটশীল শাসকবর্গকে 'কুচ নেহী'-এর পর্যায়ে দেখেন।

আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

"পাহাড়-পর্বত ও সাগর-মহাসাগর তাদের আন্দোলনের সামনে সংকুচিত হয়ে যেত। এত কিছু করা সত্ত্বেও তারা উভয় জগতে আত্মার প্রবৃদ্ধিতে মশগুল হয়েছে। কী আশ্চর্য তাদের এ অঙ্গীকার! তাদের তৃপ্তি ছিল কত সুন্দর।"

জাগতিক শক্তি ও দাপটের নিক্তিতে ওজন করে দেখলে গোটা মানবতা যেন বাঘের মুখে ছিল, এমন কি বাঘের দু' চোয়ালে তা চোয়ালবদ্ধ ছিল। আরবরা অভিযানে বের হলে বাহু-অস্ত্র শক্তি ছাড়া আর এক প্রকারের শক্তি নিয়ে বের হতো। তাদের সেই শক্তি ছিল অলৌকিক, ঐশী ও আসমানী কুদরতী শক্তি। তারা অপরাপর জাতি থেকে এক স্বতন্ত্র শক্তির (Power) অধিকারী ছিল। তারা রিক্তহস্ত ও বুভুক্ষ থাকলেও যে দেশ তারা দখল করত যেখানে লুটেরা ও স্বৈরাচারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো না, বরং একত্ববাদের মোহতানে মোহগ্রস্ত হয়ে আসমানী শক্তির রহস্য উদ্ঘাটন করে তাই-ই বুকে আগলে দেশ শাসন করত। তাদের সামনে খুলে গিয়েছিল ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্যের দ্বার। জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপে তারা অনন্ত জীবনের স্বপ্নের ঠিকানাকে লক্ষ্য করে

এগুত। জ্ঞান খুঁজে পেয়েছিল মানবতার মসনদ। কেবল পেট পূজাই মানুষের মূল পরিচয় নয়, বিলাসবহুল জীবন যাপন নয়, তাদের মূল পরিচয় হচ্ছে, "তারা মানুষ। মানুষের জীবন রহস্য উদ্ঘাটন করে তারা অনুধাবন করতে পারে জাগতিক জীবন এবং তার প্রাসঙ্গিক যা কিছু আছে সবই নিরর্থক; তাই জাগতিক জীবনকে তারা তুচ্ছ মনে করে এবং সিংহের জাতি অলসতার নিদ ভেঙ্গে স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। কাইসার ও কিসরা পিঞ্জিরায় কূজনরত পাখির মত বদ্ধ ছিল। পিঞ্জিরা খুব মনোরম। এর তলা স্বর্ণ দিয়ে তৈরী, ওপরের ছাউনি স্বর্ণের, খাদ্য বাসনও ঐ স্বর্ণনির্মিত। কিন্তু শত হলেও পিঞ্জিরা পিঞ্জিরাই। সোনার হোক কিংবা লোহার হোক, প্রশস্ত হোক কিংবা সংকীর্ণ, ঝিল থাকুক কিংবা নহর, এর মধ্যে উঁচুনীচু পাহাড়-উপত্যকা থাকুক বা না থাকুক; সর্বাবস্থায় সে তো জেলখানা! সেখানে স্বাধীনভাবে ফুড়ুত করে উড়াল দেয়া যায় না।

আরব জাতি রাজমুকুটধারী এসব রাজন্যবর্গকে, যাদের অনেকে ছিলেন শাহানশাহ ও গভর্নর, কেউ বা ছিলেন জেনারেল-সিপাহসালার, কেউ বা দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী, শাহজাদা ও ভাবী সম্রাট ছিলেন অনেকে, এদের সবাই আরবদের কাছে তেলের ড্রামের মত ছিলেন। এদেরকে তারা ফোলাফাঁপা বেলুনের মত মনে করত।

তারা মনে করত এই জাতি নির্জীব, এদের অন্তরনদী শুষ্ক, জ্ঞানবুদ্ধি বিবেক ন্যুজ, তারা আপনার ব্যর্থতা নিয়েই ব্যস্ত। মানুষকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে পূজা করা ছিল এদের ধর্ম। দরকার ছিল এদের জীবনকালকে পরিবর্তন করা। এদেরকে মানুষ পূজা থেকে এক আল্লাহর পূজায় নিমগ্ন রাখার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ওদের বেশভূষা চাকচিক্যময় থাকলেও অন্তরলোক ছিল বাতিল আক্বীদায় তমসাচ্ছন্ন।

এই আরব্য কাফেলা বিজয়ের নেশায় বের হয়েছিল, বের হয়েছিল মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে, কদম বাড়িয়েছিল বর্বরতার তুফান থেকে জগৎবাসীকে স্বস্তির উপকূলে পৌছে দিতে, আবহমান কালের শোষিত জনপদকে শান্তির পয়গাম শোনাতে, সংকীর্ণ দুনিয়া থেকে প্রশস্ত দুনিয়ার জৌলুস দেখাতে। তারা জাগতিক প্রাচুর্যকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেন। হুকুমতের রাজন্যবর্গকে দেখেন তালপাতার সেপাইয়ের মত। ওদের অস্ত্রশস্ত্রকে পুতুল খেলার কাঠি মনে করতে থাকেন। প্রাসাদোপম মহলগুলোকে তাসের ঘর মনে করেন। বিশাল পৌত্তলিক সৈন্য বহর তাদের কাছে ইতর গরু-বকরীর পালের মত মনে হতে থাকে। তারা ভেবে দেখেন এই অথর্ব খরদেমাগ জাতিকে নবুওয়াতী ছোঁয়া দিতে না পারলে এই অভিযান ব্যর্থ হবে। তাই বুকে অদম্য সাহস, হাতে তরবারি আর মুখে রাসূল করীম (সা.)-এর অমীয় বাণী নিয়ে ছুটে চলেন দেশ থেকে দেশান্তরে।

কুরআন পাক জাহেল আরব জাতিকে তাহজীব-তামাদ্দুন শিক্ষা দিয়ে এক আদর্শবান জাতিতে রূপান্তরিত করেছিল। তারা জড়বাদকে পিছে ফেলে বাস্তববাদী হয়েছিল। দেখিয়েছিল কুরআনের দিশা আরব-অনারবীদের সমান তালে।

সমবেত শ্রোতামণ্ডলি! এক্ষণে আমরা জাতিসংঘের সদর দপ্তরে অবস্থান করছি। আজ আমাদেরকে বিবিধ রাষ্ট্রনায়করা খবরদারির করছে, তবে তাদের খবরদারির আর সেদিনের আরবদের খবরদারি মধ্যে বেশ পার্থক্য ছিল। আফসোস! আমরা তো সেই জাতি যারা একদিন অন্যের খবরদারি করতাম, আর আজ আমাদের করছে অন্য জাতি। সেদিন আমরা পেয়েছিলাম কুদরতের পক্ষ হতে মহাসনদ, মহাসান্ত্বনা ঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ -

এ আয়াত নাযিলের যুগে ইসলাম দুধের বাচ্চার মত ছিল। এক পা দু'পা করে সে চলাচল করত। এমতাবস্থায় তাদের আল্লাহ্ তা'আলা বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছেন। মহামহিমের এই বাণীর উদ্দেশ্য সেদিন আরবরা যদি হতে পারে তাহলে আজকের এক শ' কোটি জনতা কি ঐ আয়াতের যোগ্য অধিকারী হতে পারে না? আজ আমরা ছোটখাট চল্লিশটি রাষ্ট্রের মালিক। এক্ষণে আমাদের বহু দেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করছে। যদিও বর্তমানে আমরা পারমাণবিক শক্তির অধিকারী নই, যদিও আমরা অত্যাধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে বহু পেছনে, আসমানী শিক্ষাকে দেখছি ঘৃণা ভরে, তথাপিও কুরআনের চিরন্তন নীতির প্রেক্ষাপটে আমরা আবার সেই পূর্বেকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারি, যদি আমাদের ইচ্ছে ও সাহস সমানভাবে সহায়ক হয়। বাস্তবিকপক্ষে মুমিনের আসল অস্ত্র হচ্ছে ঈমান-আমল চালিকা শক্তি ঐ জিনিষটির। তেল না থাকলে কুপির যেমন মূল্য নেই, ঠিক তেমনি ঈমান ছাড়া মুমিনের আর কোন অস্ত্র নেই। এই মুমিনরাই গোটা বিশ্বের শক্তি ও সাহস। বদরের দিনে রাসূল (সা.) তাই দোয়াচ্ছলে বলেছিলেন ঃ

اللهم هذه عصابة ان تهلك هذ القوم -

হুজুর (সা.) বুঝেছিলেন এখন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া গতি নেই। হুজুরের সত্তা আল্লাহর খাস নূরে নূরান্বিত ছিল, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল তাঁর স্বভাবজাত গুণ, পরিস্থিতির সামাল দিতে তিনি ছিলেন অনন্য। ইসলামের সূচনাকালেই সংখ্যাধিক্য থাকলে ইসলামের বিকাশ-প্রসার এতটা সম্ভবপর হতো না।

বদরের যুদ্ধে মাত্র তিন শ' তের জন জানবাজ সিপাহী মুকাবেলা করেছেন তিন গুণ সৈন্য ও অস্ত্রবলে বলীয়ান পৌত্তলিক মুশরিকদের। ঐতিহাসিকরা ভেবেই পান না, কেমন করে সম্ভব হলো এই নগণ্য সৈন্যদলের বিশাল সৈন্য বহরের বিরুদ্ধে জয় লাভ করা? রাসূল (সা.) অনুধাবন করছিলেন, আল্লাহর নুসরত না পেলে এ যুদ্ধে টেকা মুশকিল, তাই তাঁর বিনয়ী দোয়ার হাত উত্তোলিত ছিল, সর্বদা মুখে ছিল এই কালাম।

ان ينصركم الله فلا غالب لكم -

মুসলিম ভ্রাতা-ভগ্নীবৃন্দ! বর্তমানে সারা বিশ্বে যে মুসলিম শাসিত রাষ্ট্রগুলো আছে, তাদেরকে একতার সেতুবন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। আমি হলফ করে বলতে পারি, আজো যদি মুসলিম জাতি তাদের স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্যবোধ ও ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে হুংকার ছাড়ে তবে সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন আমেরিকাবাসীরা কাইসার ও কিসরার মত আমাদের অধীন হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে আমরা যদি ঈমানহারা হয়ে যাই যেমনটি হয়েছে পাশ্চাত্যের দেশগুলো তবে আমাদের অবস্থা আরো নাযুক হবে। হবে আরো করুণ।

মুহ্তারাম ভাই বন্ধুগণ! এখন হুঁশিয়ার হোন! পরগাছা যেমন কোন বস্তু ছাড়া টিকে থাকতে পারে না, ঠিক তেমনি পরগাছাসুলভ মুসলিম জাতি টিকতে পারবে না। আমাদের নাম তো মাশা-আল্লাহ ইসলামী। আদমশুমারীরেও দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী, কিন্তু আল্লাহর নিক্তিতে আমরা যদি ভারী না হতে পারি তাহলে আমাদের জনম বৃথা, আখেরাত বরবাদ। অতএব, বিশাল জনগোষ্ঠীর ঈমান-আমল ভারী ও মজবুত হওয়া দরকার। আমরা যে অবস্থায়ই আছি সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমেরিকার সাথে চ্যালেঞ্জ করতে পারি, তোমরা আসমানী কিতাবের ধারক–আমরাও ধারক। তবে তোমাদের ঈমানের চেয়ে আমাদের ঈমান মজবুত। আমরা বিশ্ব ভুবনে পরগাছা হয়ে আর থাকতে চাই না। আমাদের জীবন শিশুসুলভ জীবন নয়। আমরা বীরের জাতি। আমাদের ইতিহাস আছে, আছে কালজয়ী ঐতিহ্য। আমাদের কালচার-কৃষ্টি আছে। আমাদের ধর্ম আছে, আমরা অধর্মের বেড়াজালে বন্দী নিঃস্ব জাতি নই।

আমরা ইসলামের নেয়ামত ভোগ করছি। ইসলাম আমাদের, আমরা ইসলামের। আল্লাহর মদদ থাকলে তাই আমাদের সাথে থাকবে। আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। আমাদেরকে জগত থেকে বিলীন করে দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়। অদৃশ্য সাহায্য যে জাতির কাছে এসে ধরা দেয় তাদের অস্তিত্বের পৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলা সহজ নয়। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ -

"তোমরা আল্লাহ সাহায্য করলে আল্লাহ্ও তোমাদের সাহায্য করবেন। করবেন তোমাদের কদম দৃঢ়।" [সূরা মুহাম্মদ ঃ ৭]

পক্ষান্তরে আমরা নামমাত্র মুসলমান হলে, ইসলামের দীক্ষা হতে দূরে থাকলে হতাশা-পরাজয় আমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্যবাসীরা পুরানো "লীগ অব নেশান্স"-এর পর্যালোচনা করে লিখছে যা কেবল জ্যামিতির অংকিত সমুদ্র রেখার মত নিষ্ফল সমুদ্র অর্থাৎ ওরা জাতিসংঘ গড়লেও এটা মানবতার মুক্তির জন্য করেনি, বরং মানবতাকে গলা টিপে মারতে করেছে। জ্যামিতিক সমুদ্রে আমরা বিশ্বাসী নই, বরং আমরা বাস্তব সমুদ্র গড়তে পারি এমন মতবাদে বিশ্বাসী। এই সংঘের কাছে তাই আমাদের চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। চাইলে কিছু চাও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের মর্ম উপলব্ধি করার তৌফিক দিন। ইসলাম ছাড়া গতি নেই। আল্লাহ্কে ভয় করুন, অন্য কাউকে নয়। দ্বীনের জন্য আত্মনিবেদিত হোন, পয়গামে মুহাম্মদী (সা.)-কে জগতময় ছড়িয়ে দিতে অকৃপণ হোন, ঈমান-আমল মজবুত করুন। আল্লাহ্ তাঁর কুদরতী বলে আমাদের বলীয়ান করুন, এই দোয়া করি।

পশ্চিমা গবেষকদের দৃষ্টিতে নারী

'নারী' বর্তমান বিশ্বের এক আলোচিত বিষয়। নারীর অবস্থা–অধিকার নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। সর্বশেষ বিভিন্ন ধর্মে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে শেকড়সন্ধানী পড়াশোনা করছেন গবেষকরা। সেই অধ্যবসায় ও গবেষণার আলোকে তারা খুঁজে পেয়েছেন, পবিত্র কুরআন ও ধর্মশ্রেষ্ঠ ইসলামই নারীকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দিয়েছে। একথা স্বীকার করেছেন সমকালীন প্রাচ্যের কয়েকজন ইতিহাস, সমাজ-সভ্যতা ও সংস্কৃতি গবেষক। তারা স্পষ্ট কথায় স্বীকার করেছেন, ইসলাম নারীকে তার যথার্থ অধিকার দিয়েছে। নারীকে সম্মানিত করেছে। অপূর্ব শ্রদ্ধার আসনে করেছে সমাসীন।

আমরা এখানে গবেষকদের দেয়া কয়েকটি খণ্ড জবানবন্দী পত্রস্থ করছি। প্রথমেই এমন একজন পশ্চিমা গবেষকের সাক্ষ্য তুলে ধরছি, যিনি নিজেই নারী, যিনি দীর্ঘ দিন সংস্কারমূলক প্রশিক্ষণ কর্মে নেতৃত্ব দিয়েছেন আমাদের ভারতে। তিনি 'থায়ামোফিক্যাল সোসাইটি' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানা ছিলেন। তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও অংশ নিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি একজন নারী। আর যে কোন নারী 'নারী বিষয়ে' অত্যন্ত সচেতন হবেন এবং কোন অবিচারের প্রতিবাদী হবেন এটাই স্বাভাবিক। তিনি হলেন মিসেস এ্যানি বেসান্ট (Mrs. Annie Besant)। তিনি বলেন, "আপনি এমন অনেক লোক পাবেন, যারা ইসলামের সমালোচনা করে শুধু এ কারণে, ইসলাম একাধিক বিবাহকে বৈধ করেছে অবশ্য সীমিত সংখ্যায়, কিন্তু লন্ডনের একটি সেমিনারে আমি করেছিলাম একটি ভিন্ন অভিযোগ। আমি উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে বলেছিলাম, একটিমাত্র বিবাহের ধুয়া তুলে অসংখ্য নারীর সাথে মেলামেশা শুধুই মুনাফেকী ও ভণ্ডামি। সীমিত একাধিক বিবাহের বৈধতার চাইতেও বেশি অপমানজনক এটা। আজ মানুষ এই জাতীয় কথাকে অপছন্দ করে, অথচ এগুলো বলা দরকার। কারণ আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, নারী সম্পর্কে ইসলামী রীতিনীতি আমাদের এই ইংল্যান্ডেও কিছুকাল আগ পর্যন্ত মানা হতো। ইংল্যান্ডের নারী সভ্যতায় ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন খুব প্রাচীন অতীত নয় এবং এই আইনই ছিল সর্বাধিক ন্যায়সংগত ইনসাফভিত্তিক। সমকালীন পৃথিবীর সর্বাধিক সুন্দর ও নীতিসমৃদ্ধ আইন ছিল এটা। এই আইনে, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার স্বত্ব ও তালাকের ব্যাপারে পশ্চিমাদের চাইতেও অধিক উন্নত ছিল এই আইন। নারীর অধিকারের যথার্থ সংরক্ষক ছিল এই আইন। কিন্তু এই বিবাহ আর একাধিক বিবাহের স্লোগান মানুষের বিবেক-বুদ্ধি ঘুলিয়ে ফেলেছে, অথচ তারা দৃষ্টি মেলে দেখে না, এই প্রাচ্যে একজন নারীকে বার্ধক্যে যখন 'মন

ভরে না' অভিযোগ এনে রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়, তখন আর তার কোন সাহায্যকারী থাকে না। তারা ভাবে না এই অপমান থেকে নিষ্কৃতির উপায় সম্পর্কে।"

মিস্টার এন. এল. কলসেন (N. L. Coulsen) লেখেন, "নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের শিক্ষা অনন্য, বিশেষ করে বিবাহিতা নারী সম্পর্কে কুরআনী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে ইসলামের প্রচুর আইন রয়েছে। এর উদ্দেশ্য নারীর মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করা। আরবদের রীতিনীতিতে ইসলামের এই আইন অপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে নিয়ে স্বতন্ত্র আইন রচনা করেছে, যা ইতিপূর্বে আর হয়নি। ইদ্দতের সীমারেখা নির্ধারণপূর্বক তালাকের আইনে পবিত্র কুরআন এক ব্যতিক্রমী পরিবর্তন সাধন করেছে।

ধর্ম ও সভ্যতা বিষয়ক বিশ্বকোষের এক প্রাবন্ধিক লিখেছেন, ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) আরব্য সমাজের অবহেলিত নারী জাতিকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই, বিশেষ করে যে নারী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত জানোয়ার হিসেবে গণ্য হতো, সেই নারী মৃত স্বামীর সম্পদের ভাগীদারের মর্যাদা পেয়েছে। অধিকন্তু ইসলাম তাকে দিয়েছে স্বাধীন জীবন। সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতেও এখন বাধ্য নয়। স্বামী তালাক দিলে স্ত্রীকে খোরপোষ দেয়ার বিধান প্রবর্তন করেছে ইসলাম। তাছাড়া বিবাহের সময় উপহার হিসেবে যা পেয়েছিল, তাও ফেরত দিতে হয়।

উঁচু শ্রেণীর নারীদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-সাহিত্যের প্রতিও ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। তাদের কেউ কেউ গদ্যে ও পদ্যে উচ্চতর স্বাক্ষর রেখেছেন। অনেকে তো শিক্ষিকা হিসেবেও সাহিত্যকর্ম করেছেন। সাধারণ শ্রেণীর নারীরা নিজেদের ঘর-সংসারে নেতৃত্ব দিয়েছেন, রাণীর মত স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করেছেন। তারা সুখ-দুঃখে স্বামীর অংশীদার হয়েছেন। মায়েরা অসামান্য মর্যাদা লাভ করেছেন।

নব প্রজন্ম

পবিত্র কুরআন আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষার আলোকে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে আধুনিক কালের গবেষকদের এই চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি নারী জাতির জন্যে একটি নতুন দিগন্ত বলা যায়। বলা যায় একটি নতুন নির্দেশনা, নতুন পথ। কারণ ইসলাম-পূর্ব যুগে নারী ছিল চরমভাবে অবহেলিত। গৃহপালিত পশু, বাজারের পণ্যসামগ্রী আর নারীর মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। বন্ধক রাখা হতো। তারা ব্যবহৃত হতো রংমহলের শোভা-সৌন্দর্য হিসেবে।

অধঃপতনের এই ভয়ানক দুর্দিনের আবির্ভূত হলো এই নতুন সভ্যতা—শুরু হলো মহাইনকিলাব। এ বিপ্লব ছিল চরিত্র, সভ্যতা, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে পরিবার ও দাম্পত্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠার বিপ্লব। বরকতময় এই বিপ্লবের ছোঁয়া লেগেছিল সর্বত্রই এবং এটাই ইসলাম। এই বিপ্লবের স্বাদ ভোগ করেছে কম-বেশী সকল রাষ্ট্রই। সকল দেশ সমাজই এই বিপ্লবকে সামর্থ্য মাফিক স্বাগতম জানিয়েছে, বিশেষ করে যে সব দেশে ইসলাম বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করেছে, সেসব দেশ অথবা যেখানে ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেয়েছে কিংবা আমলী দাওয়াত ও আমলী নমুনা হিসেবে যেখানে প্রবেশ করেছে, সেখানেই এই বিপ্লব অভ্যর্থনা পেয়েছে, অভিনন্দিত হয়েছে।

ইসলামের এই মানবিক উপহার সে সব দেশে সর্বশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে, যেখানে বিধবা নারীরা স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিত অবলীলায়। সমাজও তাদেরকে স্বামীর পরে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার উপযুক্ত মনে করত না, তারা নিজেরা ভাবত, পতির পরে আর বেঁচে থাকার অধিকার কোথায়? এই অন্ধকারে আলোর প্রদীপ জ্বেলেছে ইসলাম। বঞ্চিতাদের এই আঁধার ভাগাড়ে ইসলাম এনেছে নয়া বিপ্লব। মুসলমান বাদশাহগণ তাদের শাসন আমলে এসব হিন্দুআনী অপসংস্কৃতির দাওয়াই করেছেন যত্নের সাথে। তাদের সংশোধনের পথ করে দিয়েছেন, বিশেষ করে 'সতীদাহ' প্রথাকে এমনভাবে সংশোধন করেছেন যাতে ভারতীয় সভ্যতাও পথে মারা যায়নি এবং অপমানিতও হয়নি, অথচ আসল সত্য জেগে উঠেছে স্বমহিমায়। এ সম্পর্কে ফ্রান্সের প্রখ্যাত পর্যটক ডক্টর বারনিয়ার লিখেছেন ঃ

"আজকাল ভারতবর্ষে সতীদাহের হার কমেছে। কারণ এ দেশের মুসলিম শাসকরা এই পাশবিক প্রথাটি নির্মূল করতে যার পর নাই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। অবশ্য এ ব্যাপারে সরকারী কোন সুনির্দিষ্ট আইন নেই। কেননা এ দেশের শাসকদের নীতি হলো, তারা সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ধর্মীয় রেওয়াজবিরোধী কোন কিছু করা প্রশাসনিক নীতির পরিপন্থী, বরং সকল ধর্মের সমান স্বাধীনতা স্বীকৃত এখানে। এরপরও বিভিন্ন কায়দা-কৌশলে তারা সতীদাহের সংস্কৃতিকে নির্মূল করতে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। যেমন কোন মহিলা প্রাদেশিক হাকিমের অনুমতি ছাড়া সতীদাহ করতে পারবে না বলে আইন করা আছে। আর প্রাদেশিক হাকিম তাকে ঘোরাতে থাকেন। যদি পূর্ণাঙ্গ আস্থা হয়ে যায়, এই নারী স্ব-ইচ্ছাই অটল, সে এই সিদ্ধান্ত থেকে আদৌ ফিরে আসবে না, তখনই কেবল কোন নারীকে সতীদাহের অনুমতি দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে হাকিম বিধবাকে বিষয়টি বোঝাতে চেষ্টা করেন। তর্ক-বিতর্ক হয়। তাদেরকে বিভিন্ন আশা দেয়া হয়। ভয় দেখানো হয়। তখন কোন কৌশলই যদি কাজে না লেগে, তখন অন্দর মহলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। মহলের বেগমরা তখন তাকে বিষয়টি বোঝাতে চেষ্টা করেন।

এত সব কায়দা-কৌশলের পরও সতীদাহের সংখ্যা এখনও বেশ, বিশেষ করে যে সব রাজার এলাকায় মুসলমান হাকিম নেই, সেখানে সতীদাহের সংখ্যা বেশি।" এটা বাদশাহ শাহজাহানের আমলের কথা।

আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিতে নারী

বর্তমান সময়ের দার্শনিক কবি ডক্টর ইকবাল এমন সময় শিক্ষা লাভ করেছেন যখন নারী স্বাধীনতা সংগ্রাম একেবারে স্লোগানে সারা পৃথিবীকে এমনভাবে মাতাল করে রেখেছিল এর বিপরীত কোন শব্দ উচ্চারণ করার কারও হিম্মত হতো না। নারী আন্দোলনের শিংগার ধ্বনিতের হারিয়ে যেত যে কোন প্রতিবাদী কণ্ঠ। ইকবাল লেখাপড়া করেছেন ইউরোপ। তাঁর অবশিষ্ট জীবন কেটেছে নারী স্বাধীনতার আর সমানাধিকার সংগ্রামের পবিত্র ভূমিতে। নারী বিপ্লবের তপ্ত বাতাস ইকবালের জীবনকে অতিষ্ঠ করে ফেলবার উপক্রম করেছিল বটে। কিন্তু ইকবাল হোঁচট খাননি। তাঁর চিন্তা ব্যাহত হয়নি। পরাজয় বরণ করেনি তার আদি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম বিশ্বাস আধুনিক কালের ভঙ্গুর স্লোগানের কাছে। অপরিপক্ব অযৌক্তিক বোঝাপড়া করতে সম্মত হয়নি।

ইকবাল নারী বিপ্লবে প্রকম্পিত ইউরোপে বসে বরং অবলোকন করেছেন ভিন্ন দৃশ্য যে দৃশ্য স্থান পায়নি অন্য অনেকের দৃষ্টিতে। ইকবাল দেখেছেন, প্রাচ্যের দেশগুলোতে সর্বত্র কেবল বিশৃংখলা। কোথাও বাঁধন নেই। নিয়ন্ত্রণ নেই। মানবতার মৃতদেহগুলো সেখানে লা-ওয়ারিস হয়ে পড়ে আছে। এই বিশ্বাসভেজা দৃশ্য ইকবালকে অনুপ্রাণিত করেছে। ইকবালের চেতনাকে করেছে আরও শাণিত। তাঁর ঈমানকে দিয়েছে অবিনশ্বরতা। ইকবাল খুঁজে পেলেন, পশ্চিমা নারী আর মুসিলম নারী এক নয়। একজন মুসলিম নারী কখনো কোন পশ্চিমা নারীর জীবনাদর্শকে অনুসরণ করতে পারে না, বরং এড়িয়ে চলা তার জন্যে অনিবার্য। ইকবালের দৃষ্টিতে কোন নারীর জীবনে শৃংখলা ও প্রতিষ্ঠা আসতে পারে না, যদি তার মধ্যে নারীত্ব, সাধুতা, পবিত্রতা, সততা ও মায়ের মমতা না থাকে এবং যে সম্প্রদায় এ কথাটি জানে না, বিশ্বাস করে না, সে সম্প্রদায়ের জীবনে কখনো প্রতিষ্ঠা আসবে না। তারা আজীবন বিশৃংখলা-ক্ষত, পরাজিত এক দুর্বল সম্প্রদায় হিসেবে বেঁচে থাকবে। ইকবালের ভাষায় ঃ

جہاں رامحکمی ازامہات است
نہاد ستاں امین ممکنات است
اگایں نکتہ راقولی ندانند۔
نظام کاروبارش بی ثبات است

কবি ইকবাল মনে করেন, তাঁর জীবনের সকল উন্নতি, সচেতনা, চেতনা, বিশ্বাস-চিন্তা-বেদনা সবই তাঁর মায়ের তরবিয়তের ফসল। তাঁর মায়ের আত্মিক পবিত্রতা ও স্বচ্ছতার অবদান। তিনি বলেন, আমার মধ্যে ঈমান ও ভালোবাসার যে জ্যোতির্ময় দীপ্তি নজরে পড়ে এটাই আমার তাপসী মায়ের দৃষ্টিতে বরকত। আমি যা কিছু পেয়েছি তাঁর কোলেই পেয়েছি, তাঁর তরবিয়তের মধ্যেই পেয়েছি। পাঠশালা আমাকে অন্তর্দৃষ্টিও দেয়নি, দেয়নি কোন ব্যথিত হৃদয়, বেদনাশীল অন্তর। এই সম্পদ কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে আছে কিছু গল্প-কাহিনী। ঈমান ও ব্যথা অনুভব করার মত অন্তর তো কেবল সেই পেতে পারে, যার তরবিয়ত ও লালন-পালন হয়েছে কোন ঈমানদার মায়ের কোলে। ইকবালের ভাষায় ঃ

مراداوایں خرد بودرجنبو نی
مکاہ ماد رباك اندرونی
زمکتب جشم ودل نتوان گرفتن
کہ مکتب نیست جزسحرو فسوے

ইকবাল মুসলমান নারীদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, পশ্চিমা সভ্যতা যুবক পটানোর যে কৌশল ও সংস্কৃতি এবং ভিন পুরুষকে কুপোকাত করার কলা-শিল্প নারীদেরকে শিখিয়েছে, তা কোন মুসলিম নারীর ভূষণ হতে পারে না। তিনি নারীদের উদ্দেশে আরও বলেছেন, যে সব ফ্যাশন আর রূপচর্চা মুসলমান দেশগুলোতে এখন নন্দিত আর্ট হিসেবে সমাদৃত হচ্ছে, এ সবেরও তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই। গাঁজা আর পাউডারের সৌন্দর্যের প্রতি যেন তোমাদের আত্মার আকর্ষণ না হয়। কারণ তোমার মর্যাদা, তোমাদের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব ওই মেকী রূপ লাবণ্যে নেই। সে তো তোমাদের পবিত্র দৃষ্টির মধ্যে নিহিত। যে নারীর মন পবিত্র, সে তো প্রকৃত সুন্দরী।

আল্লামা ইকবাল আরও বলেন, সৌন্দর্য আর রূপের জন্যে তো উলঙ্গপনা শর্ত নয়! এই নব্যযুগ ও সভ্যতার কাছে কিছুই নেই। তাই সে উলঙ্গপনাকেই সম্মান ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহর নূর ও আলোকে দেখ। কত শত সহস্র পর্দার ভেতরে তাঁর অবস্থান, অথচ সেই আলোয় উজালা সারা জাহান। মুসলিম নারীদেরকেও এমন গুণে গুণান্বিত হতে হবে; তাদের আত্মাকেও আলোকিত করে তুলতে হবে এমন সব আমালাত ও পূর্ণতায় যাতে পর্দায় থেকেও তারা মানবতাকে উজ্জীবিত করতে পারে, ভাস্বর করতে পারে।

কবি ইকবাল বিশ্বাস করেন, যদি মুসলিম নারীদের মধ্যে বিশুদ্ধ ইসলামী গুণাবলী থাকে, তাহলে তারাই হবে মানবতার লালনকারী অভিভাবক বন্ধু। মানবতা সর্বদায় তাঁদের প্রতি মুখাপেক্ষী। সভ্যতা আসে, বিকশিত হয়, বিস্তৃতি ঘটে, আবার হারিয়েও যায়। কিন্তু মুসলিম নারী মানবতার এমন এক বৃক্ষ, যা কখনো বিরান হয় না, যা সদা ফলবান।

কবি মুসলিম নারীদের আরও বলেছেন, তোমার স্থান কিন্তু হৈ-হাঙ্গামা-তাড়িত মাঠ-প্রান্তর নয়। কল-কারখানা তোমার নিবাস নয়। তুমি যদি পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলেয়ে জীবিকার সন্ধান লেগে যাও, তাহলে জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হয় যা মানবতার প্রতি অবিচার হয়ে যাবে। হে নারি, তোমার সৌভাগ্য তো এখানে, তুমি নবীনন্দিনী ফাতেমার পথে চলবে। স্বামীর ঘর আবাদ করবে। স্বামীকেই বানাবে চাওয়া-পাওয়ার লক্ষ্যবিন্দু। স্বামীর ঘরে বসে এমন সন্তান গড়ে তুলবে, যারা মুসলমানদের দুর্দিনের কাণ্ডারী হবে। ইসলাম ও মুসলমানের জন্যে জীবন বিলিয়ে দেবে অকুণ্ঠ চিত্তে। এখন ইসলাম বড় অসহায়। ইসলামের জন্যে হাসান-হুসাইন (রা.) প্রয়োজন। আর এই প্রয়োজন পূরণ করতে পারে কেবল মুসলিম জননীরা।

ডক্টর ইকবাল মনে করেন, মুসলিম জাতির দিন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীরা অনেক বড় অবদান রাখতে পারে। নারীর মধ্যে আল্লাহতা'আলা এমন শক্তি, বিশ্বাস ও দরদ দিয়েছেন সে চাইলে এখনও মুসলিম জাতির ধমনীতে ঈমানের আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। ইকবাল তো ইসলামী ইতিহাসের সেই কাহিনী ভুলতে পারেন না এবং কোন মুসলিম নারীরও ভোলা উচিত নয়। কাহিনীটি হলো–এক উজ্জ্বলমতি আরব্য নারী। প্রাণ খুলে কোরআনে তিলাওয়াত করছিল। তাঁর সে হৃদয়স্পর্শী তিলাওয়াত এক কঠিন কাফের মানুষের আত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছিল। তার বিশ্বাসের রুদ্ধ ঈমানী আলো মুসলিম উম্মাহকে দান করেছিল। হযরত উমরের (রা.) মত দৃঢ়চেতা, প্রত্যয়ী, বীরযোদ্ধা আমীরুল মুমিনীন; বিজেতা রাহবর যাঁর মাধ্যমে উন্নতি ও বিজয়ের এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। প্রাণে প্রশান্তি জেগেছিল নবীজীর।

এই কাহিনী তো সকলেই পড়ে। হযরত উমর (রা.) তলোয়ার হাতে ইসলামের মূলোৎপাটনের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হন। সংবাদ পান বোন ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের কথা। ভাবেন তাঁদেরকেই আগে শায়েস্তা করা দরকার। হাজির হন বোনের ঘরে। কিন্তু বোনের ঈমান-ধোয়া কোরআন তিলাওয়াত উমরের (রা.) মনকে মোমের মত গলিয়ে দেয়। হৃদয়ে আসন পাতে ইসলাম মহাসমাদরে। ইকবালের কামনা, বর্তমান বিশ্ব আজ এমন নারীই কামনা করে। এই নারীর আজ বড় প্রয়োজন।

ধর্মনিষ্ঠ ও ধর্মহীন সরকার

[১৯৪০ সালের কোন এক সময় বাদশা সাউদ-এর নিকট আল্লামা নদভীর লিখিত পত্র।]

ধর্মহীন সরকার মূলত একটি উন্নত, সুসংগঠিত ও সুরক্ষিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এ ধরনের সরকার বাস্তব ক্ষেত্রে জনগণের উপকারের জন্য নয় বরং নিজেরা উপকৃত হওয়ার জন্যই প্রতিষ্ঠিত। মানবতার চারিত্রিক পয়গাম ও সংস্কারমূলক কোন প্রোগ্রামই তারা হাতে রাখে না, দেশ বা জাতির চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি, মানুষকে সত্যের প্রতি হিদায়ত দান ও মানবতার সঠিক খিদমতের প্রতি তাদের কোন লক্ষ্যই থাকে না, বরং সাধারণত দেখা যায়, আর্থিক আয়ের উৎস খোঁজাখুঁজি, সরকারী কর, ট্যাক্স ও দাবী-দাওয়াগুলো আদায় করে নেয়াই তাদের মূল লক্ষ্যবস্তু। এ লক্ষ্যেই তারা চরিত্র ও সম্মানের কোন নিয়ম-নীতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, জাতির চারিত্রিক শিক্ষা-দীক্ষা ও যাবতীয় মঙ্গল-কল্যাণকে তারা আর্থিক দিকগুলোকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

মোট কথা সর্বক্ষেত্রে জীবিকা ও আর্থিক উপার্জনই তাদের মূল লক্ষবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের ব্যাপক হারে ও সুসংগঠিত পদ্ধতিতে সুদী লেন-দেনে সব সময়ই মশগুল থাকে। সভ্য সুন্দর নামের লেবেলে জুয়ার মত ঘৃণ্য পেশার অনুমোদন দিয়ে দেয় নির্বিঘ্নে। শুধু নাম লেবেল পরিবর্তন করে নামে মাত্র কিছু সীমাবদ্ধতার সাথে অনেক অনেক চারিত্রিক অপরাধও সরকারী অনুমোদন লাভ করে থাকে।

মাদক দ্রব্যের শুধু অনুমোদনই নয়, বরং অনেক সময় মাদক দ্রব্যের ব্যবসা সরকার নিজের হাতেই পরিচালনা করে, এমন কি এর বিরুদ্ধে কোন কলা-কৌশল যদি কেউ ইখতিয়ার করে সরকার অনেক সাজা-শাস্তির মাধ্যমে তা প্রতিরোধ করে।

সিনেমা, অশ্লীল ফিল্ম তৈরি বলতে গেলে যা বর্তমান অপরাধ জগতের প্রধান বস্তু এবং জাতির মধ্যে চরিত্রহীনতা ও যৌন আকর্ষণ সৃষ্টির প্রধান নায়ক, একেও সরকার রাষ্ট্রীয় আয়ের বৃহত্তম উৎস মনে করে। এসব অশ্লীল কার্যকলাপের চারিত্রিক ক্ষতি ও ধ্বংস ক্রিয়াকে দেখে ও জেনেশুনেও সরকার এর প্রতিরোধ করে না।

রেডিও-টিভি তার সরকারী ট্রাইবুনাল, জাতির চারিত্রিক দীক্ষা ও শিক্ষা প্রচারের ক্ষেত্রে আনন্দোল্লাস ও ফুর্তি প্রচারণারই জিম্মাদারী পালন করে। এভাবে মানুষের মধ্যে মননশীলতা ও সঠিক রুচি-অভিরুচি সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার কু-রুচি ও

মনোবৃত্তিকে এক সহায়তা করে চলে, আপন প্রোগ্রামগুলোতেও আনন্দঘন ভাবধারাই সৃষ্টি করে, শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যম যন্ত্র হওয়ার ক্ষেত্রে একটি উল্লাসী যন্ত্র হিসেবেই সর্বমহলে বিবেচিত হয়।

এ ধরনের ধর্মহীন রাজত্বে চরিত্রের পাশাপাশি জাতির শারীরিক সুস্থতাও রক্ষা পায় না। কোন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমন এমন স্বাস্থ্যক্ষতিকর ঔষধও তৈরি করে থাকে যা পুরো দেশবাসীর স্বাস্থ্যকে শারীরিক দুর্বলতা ও রুগ্নতার শিকার করে দেয়। কিন্তু ঔষধের নামে এ ধরনের বিষ ব্যবসায়ীরা সরকারী কোন আমলাকে ঘুষ দিয়ে বা সরকারী জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মোটা অংকের টাকা দিয়ে সরকারী ধরপাকড় থেকেও মুক্তি লাভ করে নেয়। মূলত এর পেছনে কারণ হলো এসব ক্ষেত্রে সরকারের লক্ষ্য নীতি, চরিত্র হিদায়ত ও সংস্কার সংশোধন কোনটাই নয়, বরং আর্থিক ফায়দা লুটা ও সচ্ছলতা অর্জনই হলো সরকারের মূল লক্ষ্য।

এ ধরনের রাজনীতির অনিবার্য ফলাফল এই হয়ে দাঁড়ায় যে, দেশের জনগণের চরিত্র দৈনন্দিন অবনতির দিকেই ধাবিত হতে থাকে এবং একটি ভয়ানক চারিত্রিক রোগ-ব্যাধিই পরিলক্ষিত হয় পুরা জাতির মধ্যে। জাতির প্রতিটি স্তরে ব্যবসায়িক মনোভাব, অর্থ সঞ্চায়ন ও খোসামোদীর মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যায় এবং সাধারণ পর্যায়ে লুটতরাজ বৃদ্ধি পায়, একে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করার হীন চেষ্টায় লিপ্ত থাকে এবং নীতি ও চরিত্রের ধারণায় সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে।

ধর্মহীন সরকারের বিপরীত হলো ধর্মপরায়ণ সরকার মূলত যে সব সরকার নববী তরীকা তথা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রদর্শিত নিয়ম-পদ্ধতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, ব্যবসার স্থলে মানবতার হিদায়তই হয় তার বুনিয়াদ। হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.) তাঁর এক কর্মকর্তাকে বললেনঃ (যিনি ধর্মভিত্তিক সরকার পরিচালনার কারণে রাষ্ট্রীয় আয়ের ঘাট্‌তি ও আর্থিক অবনতির সমালোচনা করেছিলেন) সারা বিশ্বের অধিনায়ক মহান রাব্বুল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পৃথিবীতে সারা দুনিয়াবাসীর জন্য হাদী তথা হিদায়তকারী বানিয়ে পাঠিয়েছেন, তহসীলদার ও অর্থ উসূলকারক হিসেবে তাঁকে পাঠানো হয় নি।" মূলত তাঁর এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটিতে একটি ধর্মপরায়ণ সরকারের পরিপূর্ণ রাজনৈতিক ধারা ফুটে উঠেছে।

একটি ধর্মপরায়ণ সরকারের পুরো লক্ষ্য নিবদ্ধ থাকে সাধারণ জনগণের ধর্ম, চরিত্র ও তাদের পরকালীন লাভ-লোকসানের প্রতি। ট্যাক্স, কর আদায় ও আর্থিক উন্নয়নে প্রবৃদ্ধি একটি ধর্মপরায়ণ সরকারের মৌলিক কাজ হতে পারে না,

বরং এগুলো এর দ্বিতীয় স্তরের কাজ এবং এগুলো দেশের সংস্কার, দ্বীনী প্রোগ্রামগুলোর পরিপূর্ণতা ও রাষ্ট্রীয় শৃংখলার মাধ্যমে বিবেচিত হতে পারে। একটি ধর্মপরায়ণ সরকার রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে ধার্মিকতার প্রতিই গভীর লক্ষ্য রাখে, ধর্মীয় ও চারিত্রিক নীতিমালাকে জাগতিক ফায়দা ও কল্যাণের ওপরে প্রাধান্য দিয়ে থাকে, এ ধরনের রাজত্বের আন্তঃসীমানায় সুদ, ঘুষ, জুয়া, মদ্যপান, জিনা-ব্যভিচার, গুনাহ ও নাফরমানী সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও এসব কিছুই সুমদয় উৎসাহী-উদ্যোগী বস্তুগুলোও এমন আর্থিক কার্যকলাপ-যদ্দারা ব্যক্তিকেন্দ্রিক উপকারিতা অর্জিত হলে সমাজ বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক লোকসানই সাধিত হয়-এগুলো সবই রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ এবং সরকারী আইনের বরখেলাপই বিবেচিত হয়, যদিও এ দ্বারা সরকারের বৃহত্তম আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় এবং সরকারকে বৃহত্তম পরিমণ্ডলের অর্থায়ন হতে মাহরুম থাকতে হয়।

একটি ধর্মপরায়ণ সরকার দেশে এমন কিছু সংস্কারমূলক প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করে থাকে, যা শুধু জাতির দৈনিক কাজের সাথেই সম্পর্ক রাখে না, বরং পুরো জাতির ভাবধারা ও মনোভাবের সাথেও সম্পর্ক রাখে। কারণ চারিত্রিক ভাবধারাই দৈহিক কাজকর্মের আয়োজন যোগায়; অতএব, চারিত্রিক ভাবধারায় যদি মানুষের সৎ ও উন্নত না হয়, তাহলে দৈহিক কাজকর্মের সংশোধন, অপরাধ ও চরিত্রহীনতার দরজা বন্ধ করা কোনমতেই সম্ভব নয়। কারণ চারিত্রিক ভাবধারা উন্নত হওয়া এমন কিছু বিষয়কে বাধা আরোপ করে থাকে, যা মানুষের মধ্যে চরিত্রহীনতা, আইন লংঘন, প্রবৃত্তিপূজা ও বিলাসিতা পূজার মনোভাব সৃষ্টি করে এবং এমন কিছু ব্যক্তিবর্গকে অপরাধী ও দেশদ্রোহী সাব্যস্ত করে তোলে যারা মানুষের মধ্যে লজ্জাহীনতা, পাপ ও গুনাহ প্রীতির জন্ম দেয়, যদিও তারা জ্ঞানী হোক, ব্যবসায়ী হোক বা শিল্পী ধ্যান-ধারণার লোক হোক। একটি ধর্মপরায়ণ সরকারকে নিরাপদ অবস্থান এবং রাষ্ট্রীয় এন্তেজাম ও শৃঙ্খলার সাথে সাথে চরিত্র সভ্যতার জিম্মাদারী পরোপুরি বহন করে নিতে হবে। কারণ একটি ধর্মভক্ত সরকার শুধু একজন পুলিশ ও চৌকিদারের দায়িত্ব পালন করে না, বরং মানুষের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী মুরুব্বী ও অভিভাবক হিসেবেই দায়িত্ব পালন করে।

সাধারণত এ ধরনের একটি ধর্মপরায়ণ সরকারের পরিণাম ফলাফল তাই হয়, যা পবিত্র কুরআনে প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজির সাহাবাদের সম্পর্কে একটি ভবিষ্যৎ বাণী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ -

"তারা ঐ সমস্ত (মজলুম) মুসলমান, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতাশালী করলে তখন তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। প্রতিটি কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।"
[সূরা ঃ হজ্জ ঃ ৪১]

ধর্ম ও সভ্যতা ঃ যুগে যুগে

যে কোনো সভ্যতার নিজস্ব রূপ ও স্বকীয়তা রয়েছে। যেমন ইসলামী সভ্যতার আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমনি ভোগবাদী গ্রীক ও রোমান ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য খ্রীস্টীয় সভ্যতারও রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচিতি। এর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ও শিরা-উপশিরায় সঞ্চারিত ও সংক্রমিত ধর্মহীন গ্রীক রোমান উপাদানাবলী থেকে তাকে আলাদা করার উপায় নেই। অনুরূপ যে মুসলমান এ সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করে অযাচিত অনুগত ও ভক্তের ন্যায় তার সব কিছু গ্রহণ করবে অচিরেই সে যে একটি অনৈসলামী সভ্যতার অতল গহ্বরে নিপতিত হয়ে তা ভুলে যেতে বাধ্য হবে। যুগে যুগে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে দেদীপ্যমান। যেমন বর্বর তাতারীদের ইতিহাসে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। যখন তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মত মুসলিম বিশ্বে ঝাঁপিয়ে পড়ল, নির্যাতনের স্টিমরোলার চালিয়ে হত্যা ও যখমের বাজার গরম করল এবং মুসলিম উম্মাহকে চরমভাবে অপমানিত করল তখন একটি প্রবাদ চালু হলো, "যদি বলা হয়, তাতারীরা পরাজয় বরণ করেছে তা তুমি বিশ্বাস কর না।" এ থেকে প্রতীয়মান হয়, মুসলিম বিশ্বের দেহে ও মননে তাতারীদের কী গভীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিরাজ করেছিল! কিন্তু পরবর্তীতে কেন তারা ইসলামের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করল? এতে কি রহস্য লুক্কায়িত ছিল? মূলত তাদের এ আমূল পরিবর্তনের দু'টি উপকরণ কাজ করেছে! (১) নির্মোহ ও স্বেচ্ছাচারমুক্ত আধ্যাত্মিক শক্তি যা হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের মুত্তাকী বান্দাদের পূত-পবিত্র হৃদয় জগতে প্রোথিত ছিল; (২) কোনো সভ্যতা নয়, ধারালো তরবারির সাথে কিছু চৈনিক জাহেলী কুসংস্কার বহন করত অসভ্য তাতারীরা; তাদের জীবন যাত্রায় সভ্যতা ও নিয়মানুবর্তিতার কোনো বালাই ছিল না। তারা যখন উৎকর্ষের বিশালতা ও গভীরতায় সুশোভিত সভ্যতার মুখোমুখী হলো, স্বভাবতই তার প্রতি বিমোহিত ও অনুগত হয়ে পড়ল। নির্মল ইসলামী সভ্যতা মূর্খ তাতারীদের

এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, তার সিঁড়ি বেয়ে সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করল। নিঃসন্দেহে একটি মানব ইতিহাসে এক বিরল ও অবিস্মরণীয় অধ্যায় যার সঠিক ও পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ আজ পর্যন্ত ইতিহাস দিতে পারেনি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বাঘা বাঘা বিদ্বান এর কারণ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে বার বার হতবাক ও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন! নিঃসন্দেহে তাতারীরা ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করেছিল একমাত্র ইসলামী সভ্যতার মোহনী শক্তির প্রভাবে। কারণ তখনো তারা বেদুঈন জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। শৈশব অতিক্রম করেনি তাদের সভ্যতা। তাই যখন তারা সেই উন্নত মুসলিম বিশ্বে ঢুকে পড়ল যা সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৌড়ে অনেক এগিয়ে গেছে তখন তারা অবলীলায় ইসলামী সভ্যতার প্রতি দারুণভাবে ঝুঁকে পড়ল। তখন বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। মুসলমানরা বিস্মিত হলো তাতারীদের অদম্য বিজয়ে আর তাতারীরা বিস্মিত হলো ইসলামী সভ্যতার অনন্য রূপ দর্শনে। ভিন্ন দেশে ভিন্ন পরিবেশে প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার প্রতি অনুগত হওয়া যে কোন জাতির অনিবার্য পরিণাম হচ্ছে সেই বিদেশী সভ্যতার প্রভাবে স্বীয় অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাওয়া।

সুতরাং ভ্রাতৃমণ্ডলি, আপনাদের বলতে চাই, সভ্যতার বিষয়টি ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর পরিণামের দিক দিয়েও অত্যন্ত সূক্ষ্ম, গুরুত্ববহ ও স্পর্শকাতর। আমরা তথা মুসলিম উম্মাহ এখন জীবনের একটি কঠিন সংকটময় মুহূর্ত অতিক্রম করছি। আর তা হলো আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সব কিছু ভাল মন্দ যাচাই না করে সর্বক্ষেত্রে সমানে গ্রহণ করে চলেছি। কোন্‌টি খাঁটি, কোন্‌টি ভেজাল বা ত্রুটিপূর্ণ তা পরখ করার প্রয়োজন বোধ করছি না। খানার টেবিলে অনাহূত ব্যক্তির মত তার অথৈ সাগর থেকে অঞ্জলি ভরে নিচ্ছি এবং চতুর্দিক থেকে তার উত্তাল তরঙ্গরাজি আমাদের গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ফেলেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ইসলাম ও মুসলমানের জন্য ভয়াবহ পরিণতির ঝুঁকি রয়েছে।

হে মুসলিম ভ্রাতৃমণ্ডলি, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন করুন। আমি ইসলামী বিশ্বের বিরুদ্ধে কোনো সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের আশংকা করছি। পাশ্চাত্য জগত যখন দেখল, মুসলমানরা দ্বীনের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শকাতর, তখন তারা তাদের পুরাতন অবস্থান থেকে সরে দাঁড়ায়। ধর্মে ওপর আক্রমণ থেকে তারা অসংখ্য অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পেরেছে, মুসলমানদের আক্বীদা বিশ্বাসের পেছনে পড়া ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে এবং তাদের সমূহ প্রচেষ্টাও সুদূরপ্রসারী ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং বিকল্প হিসেবে মুসলিম বিশ্বের ওপর সভ্যতা চাপিয়ে দিয়ে পরিতুষ্ট হয়েছে। আমাদের আক্বীদা স্পর্শ করা থেকে বিরত রয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তারা যেন বলছে যাকে ইচ্ছে পুজো কর, যাকে ইচ্ছে বিশ্বাস কর, যা হতে চাও হও, যা পড়তে চাও

পড়ো, কোনই বাধা নেই, তবে হ্যাঁ, এটা আমাদের সভ্যতা। আমাদের মতো হয়ে জীবন যাপন করো। আমাদের স্টাইলে পানাহার করো, পরিধান করো, হোটেল, মোটেল, ঘর-বাড়ী, দালান-কোঠা তথা তাবৎ নির্মাণ অবকাঠামো আমাদের মডেলে তৈরি করো, তাতে ইসলামী সভ্যতার কোনো নিদর্শন ও ইসলামী ঐতিহ্যের কোনো নমুনা থাকবে না এবং থাকবে না ইসলামী শরীয়তভিত্তিক পায়খানা, প্রস্রাব ও ওজু-গোসলের কোনো ব্যবস্থা। কেননা তারা বুঝতে পেরেছে, মুসলিম বা আরব বিশ্ব যদি ধর্মহীন পাশ্চাত্য সভ্যতার এ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তবে স্বল্প সময়ের মধ্যেই নিজেদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলীর সিংহ ভাগ হারিয়ে ফেলবে এবং সীমিত পরিসরে ও নির্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যেই শুধু ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। যেমন সে মসজিদেই মুসলমান থাকবে শুধু নামাজ-দোয়া পড়বে, ইবাদত করবে কিন্তু যখন সে মসজিদ থেকে বের হয়ে বাড়ীর শরণাপন্ন হবে, হোটেল-মোটেলে অবস্থান করবে, তখন বোঝার উপায় থাকবে না সে একজন মুসলমান। তবে হ্যাঁ, যদি নাম জিজ্ঞেস করা হয় উত্তরে একটি চমৎকার আরবী নাম নিয়ে বলবে, আমি অমুকের ছেলে অমুক। সর্বসাকুল্যে এ নামটিই যেন তার মুসলমান হওয়ার একমাত্র দলীল! এটাই হচ্ছে নতুন কৌশল যা পশ্চিমা বিশ্ব দীর্ঘ তিক্ত অভিজ্ঞতার পর উদ্ভাবন করেছে। এ কৌশলের মাধ্যমে তারা মুসলিম বিশ্বকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুসারীতে পরিণত করেছে। এখন তারা মুসলমানদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও আবেগ-অনুভূতিকে নাড়া দেয় এমন কথা বলছে না, বরং সুললিত কণ্ঠে বলছে, এইতো ইসলাম ধর্ম! একেবারে নিখুঁত! যেভাবেই আপনারা চান সেভাবেই সংরক্ষিত। কুরআন তো আপনাদের হাতেই! ইচ্ছামত বিদ্যা শেখো, ইবাদত বন্দেগী করো, তাতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যুগোপযোগী মডেল সভ্যতা হিসেবে একমাত্র পাশ্চাত্য সভ্যতাকেই মেনে নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে আজকের মুসলিম বিশ্বের ভয়াবহ ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি।

আমার হৃদয়ে পুঞ্জীভূত যে ব্যথা আমাকে সব সময় তাড়া করছিল তা প্রকাশ করে প্রশান্তির নিশ্বাস নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম কোনো আরব দেশীয় শহরে একটি ইসলামী সম্মেলনে। তখন আরব শ্রোতাদের উদ্দেশে আমার সেই ব্যথার কথা বলেছিলাম এবং তা বলার আমার অধিকারও ছিল। আরব ভাইয়েরা, আপনারা আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন, আপনাদের বাধ্য করার কেউ নেই। কোনো দেশ ও শক্তির করতলে নন আজ। নতুনভাবে সমাজ গড়ার অধিকার আপনাদের রয়েছে। সমাজ সভ্যতা ও সার্বিক জীবন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাচ্ছেন যথেচ্ছা। কিন্তু কে আপনদেরকে এত প্রচণ্ড বেগে ও তীব্রভাবে সেই পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে কল্যাণকর ও শান্তি-শৃঙ্খলার ধারক-বাহক

বলতে কিছুই নেই, অথচ মহান আল্লাহ আপনাদের প্রচুর অর্থ-সম্পদ ও শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে সম্মানিত করেছেন, বরং আজ পাশ্চাত্য জগত আপনাদেরই মুখাপেক্ষী । কেন আপনারা নিজেদের ইচ্ছা ও আগ্রহকে অন্তত নিজেদের দেশে ব্যক্ত করছেন না? আমি তো সেই শুভক্ষণের প্রত্যাশায় রয়েছি, যখন আমরা মুসলমানরা নিজেদের পছন্দ ও আগ্রহ পশ্চিমাদের ওপর চাপিয়ে দেব। কিন্তু সেই সময় এখনো আসেনি। তাই কেন অন্তত আমাদের কামনা-বাসনা, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাকে আমাদের দেশ, সমাজ-সভ্যতায় ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না,? সুন্দর ইসলামী ধাঁচে আমরা নির্মাণ অবকাঠামো সৃষ্টি করতে পারি। ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি ও তাহজীব-তামাদ্দুনের সাথে সংগতিপূর্ণ ইসলামী মডেলে হোটেল-মোটেল নির্মাণ করা যায়, যা ওজু-তাহারাত, নামাজ ও জিকির-আসকারের সহায়ক হয়। পরিবেশ ভাল-মন্দ দুটিরই উদ্ভব ঘটায়। কিন্তু এসবের পরিবেশ মঙ্গলময় ও আল্লাহর জিকিরের সহায়ক হবে। মানুষ স্বভাবত আল্লাহকে ভুলে যায়। কিন্তু যখন সে এ ধরনের পরিবেশে পদার্পণ করে এবং তার নির্মলতায় সিক্ত হয়, তখন আল্লাহর কথা, পরকালের কথা মনে পড়ে, এমন অবস্থাই ছিল ইসলামের স্বর্ণ যুগে। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র নগরী মদীনা মুনওয়ারা বা অন্য যে কোনো ইসলামী শহরে প্রবেশ করতেই ইসলামের স্নিগ্ধতা ও সৌরভে যে কারো অন্তরাত্মা ভরে যেত। নাকে তার সুঘ্রাণ নিত। হাতে স্পর্শ করত, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করত। অতঃপর এক জগত থেকে অন্য জগতে এবং এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে বয়ে নিত। এভাবেই ইসলামের ধারণা অর্জন ও তার মধ্যকার দূরত্ব কমে যেত এবং সহজ হয়ে যেত বরং ইসলাম মতে আমল করা তার কাছে অতি প্রিয় বস্তুতে পরিণত হতো। যখন সে ইসলামের এই মডেল টাউন সোসাইটি থেকে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করত ইসলামের একজন প্রাজ্ঞ প্রচারক ও অনুপম আদর্শের ধারক-বাহক হিসেবেই প্রত্যাবর্তন করত, আজকের আরবের শহরগুলোর পরিবেশও সোনালী যুগের মতো হোক, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা। এর বিপরীত পরিবেশ নয় বা আমাদের তাহজীব ঐ তামাদ্দুনের সাথে সাংঘর্ষিক। তবে আক্ষেপের বিষয় হলো কল্পনার সাথে বাস্তবতার কোনো মিল নেই। বর্তমানে অতীতের স্বীকৃতি নেই। ফলে সুশীল সমাজ গঠন ও নিষ্কলুষ সভ্যতা প্রতিষ্ঠার সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ তথা মানব জীবনের সাথে সংগতিপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণে ইসলামের সক্ষমতা সম্পর্কে সংশয়ের সৃষ্টি করা হচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই যাকে চান সঠিক পথের দিশা তাকে দান করেন।

কাদিয়ানী মতবাদ ঃ ইসলাম ও নবুওয়তে মুহাম্মদী (সা.)-এর বিরুদ্ধে জঘণ্য বিশ্বাসঘাতকতা

আমি বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এমন একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব যা প্রত্যেক মুসলমানেরই, তিনি যে কোন দেশেই অবস্থান করুন না কেন, মনোযোগ আকর্ষণ করার দাবীদার।

বিষয়টি ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর (বুনিয়াদী ভিত্তি) সাথে সম্পর্কিত। মুসলমানগণ যদি এ ব্যাপারে উদাসীনতা প্রদর্শন করেন, তাহলে এ সমস্যা এমন এক বিপদসঙ্কুল রূপ ধারণ করবে, যা গোটা ইসলামী জগত, এমন কি পুরো ইসলামী বিধানের জন্য গুরুতর আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াবে এবং যার ক্ষতি হবে অপূরণীয়।

ইতোপূর্বে (পাকিস্তানে) যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়ে গেল, তা সকল জ্ঞানী-গুণী লোকদের মনোযোগকে কাদিয়ানী সমস্যার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। কাদিয়ানী সংক্রান্ত যে বিষয়টি মানুষ ভুলতে বসেছিল, হাঙ্গামা তাদেরকে আবার তা স্মরণ করিয়ে দিল। শুধু কি তাই? অনেকে তো আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, আসলে কাদিয়ানী সমস্যা কি এতই গুরুতর ও বিপদসঙ্কুল, যা সমগ্র মুসলিম জাতির মনোযোগ ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হতে পারে?

কিন্তু এতে কিছুই করার ছিল না। মূলত সমস্যাটি তার নিজস্ব ভাবধারায় এ গুরুত্ব পাওয়ার দাবীদার। ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন লোকদের ঐদিকে দৃষ্টি দেয়া অবশ্যই যথার্থ। কেননা মুসলমানদের অস্তিত্ব ও ইসলামের ভবিষ্যতের জন্য এটি একটি অস্বস্তিকর বিষয়।

খুব কম লোকই এর আসল প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত আছেন, সমস্যাটির আসল গুরুত্ব কি? ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সাথে এর সম্পর্ক কতটুকু গভীর?

এ দ্বন্দ্ব কোন ফেরকা সৃষ্টি করা, সংকীর্ণতা ও মাযহাবী সাম্প্রদায়িকতার বীজ নয়, যেমনটি কারো কারো ধারণা।

বরঞ্চ নির্ভেজাল খালেস ইসলামী স্বার্থ ও মুসলমানদের যিন্দেগীর সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

আসুন, ইতিহাস ও জ্ঞানের নিরিখে তা নির্ণয় করা যাক। জ্ঞান-গবেষণায় ও ঐতিহাসিকভাবে এ কথা প্রমাণিত, কাদিয়ানী মতবাদ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক গর্ভের জারজ সন্তান। ব্যাপারটি হলো এই, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম

চতুর্থাংশ হিন্দুস্থানের বিখ্যাত ও সুপরিচিত বীর মুজাহিদ সাইয়েদ আহমদ শহীদ (মৃত্যু-১২৪৬ হিজরী, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দ) মুসলমানদের মধ্যে জিহাদের যে আন্দোলন শুরু করেন, তাতে মুসলমানদের মাঝে জিহাদের ও কোরবানীর স্পৃহা আগুনের মত জ্বলে ওঠে। আল্লাহর পথে ইসলামী বীরত্ব প্রদর্শন ও প্রাণ উৎসর্গ করার ঐতিহ্যবাহী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে হাজারো মুক্তিপাগল মানুষ সাইয়েদ আহমদ শহীদের বিদ্রোহের পতাকাতলে জমায়েত হন। এমন অভ্যুত্থানের জোয়ার বৃটিশ সরকারের জন্য অস্বস্তি, দুশ্চিন্তা ও শংকিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে সুদানে শায়খ মোহাম্মদ সুদানী জিহাদের ডাক দেন। তাতে সুদানে বৃটিশ ক্ষমতার কম্পন শুরু হয়। তারা এটা ভাল করেই জানত, বিদ্রোহের এ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ একবার যদি জ্বলে ওঠে, তাহলে এটা নির্বাপিত করা আর সম্ভব নয়।

অন্যদিকে সাইয়েদ জামালুদ্দীন আফগানীর ইসলামী ঐক্যের আন্দোলন দিকে দিকে প্রসার এবং মুসলমানদের মাঝে তা গ্রহণযোগ্য হতে দেখে তার আন্দোলনের যৌক্তিক পরিণতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে বৃটিশ শোষকগোষ্ঠী মুসলমানদের চরিত্র, প্রবণতা ও দুর্বলতার ওপর ব্যাপক সমীক্ষা ও গবেষণা চালায়। তারা বুঝতে পারল, প্রকৃতিগতভাবে মুসলমানগণ ধর্মভাবাপন্ন। ধর্মই তাদেরকে উজ্জীবিত করতে পারে, আর ধর্মই তাদেরকে শান্ত করে দিতে পারে।

অতএব, মুসলমানদেরকে দমন ও নিস্তেজ করে দেয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে তাদের আক্বীদা, ধর্মীয় চেতনা ও মন-মানসিকতার ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

ধর্মীয় পথ ছাড়া মুসলমানদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার দ্বিতীয় কোন বিকল্প নেই। তাই এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশে বৃটিশ সরকার এই মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করল, মুসলমানদের মধ্য থেকেই কোন এক ব্যক্তিকে অতি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় পদবীর ছত্রছায়ায় আত্মপ্রকাশ করাতে হবে যাতে করে সাধারণ মুসলমানগণ অধ্যাত্ম চেতনায় ভক্তি সহকারে তার দরবারে এসে সমবেত হয়।

ঐ ব্যক্তি অনুসারীদের বৃটিশ সরকারের অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে জীবন যাপন করার এমন শিক্ষা দেবে যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইংরেজদের আর কোন বিপদাশঙ্কা থাকবে না, পরিকল্পনা মাফিক যাতে করে অবদমিত হয়ে যায় বিদ্রোহের চেতনা।

এটা ছিল বৃটিশ সরকারের একটি চক্রান্ত। কেননা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি পরিবর্তনের দ্বিতীয় কোন পন্থা এর চেয়ে বেশী কার্যকরী ছিল না।

মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর, যে ছিল মানসিক অস্থিরতা ও হতাশার শিকার, মাঝে একই সময় তিনটি এমন জিনিসের সমাবেশ ঘটিয়েছিল, যা দেখে

কোন ঐতিহাসিক এ সিদ্ধান্ত পৌছাতে পারতেন না, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও আসল কারণ কোন্‌টিকে বলা যেতে পারে, যার ভিত্তিতে লোকটি এসব কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ

ক. ধর্মীয় নেতৃত্বে পৌঁছা এবং নবুওয়তের নামে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে প্রভাব বিস্তার।

খ. তার ও তার অনুসারীদের বইপত্রে বারবার আলোচিত আজব আজব ধ্যান-ধারণার উল্লেখ দেখা যায়।

গ. অস্পষ্ট ও গোলমেলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, স্বার্থসিদ্ধি ও বৃটিশ সরকারের প্রতি অপরিমিত আনুগত্য।

সে মনে মনে তীব্রভাবে এমন একটি ধর্মের প্রবর্তক হওয়ার আশা পোষণ করত, যার কিছু অনুসারী হবে, কিছু লোক তার ওপর ঈমান আনবে এবং ইতিহাসে তার নাম ও মর্যাদা তেমনই হবে, যেমনটি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর।

ইংরেজরা এ কাজের জন্য একজন উপযুক্ত লোকের সন্ধান পেল। বলা যায়, তার চরিত্রে একজন এজেন্টের চরিত্র পাওয়া যায়, যে তাদের স্বার্থে মুসলমানদের মাঝে কাজ করবে।

অতএব, সে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে কর্মতৎপরতা শুরু করল।

প্রথমে মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক (Renovator) হওয়ার দাবী করল। তারপর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ইমাম মাহদীতে পরিণত হলো। কিছুদিন পর প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার সুসংবাদ পেয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত নবুওয়তের সিংহাসনে সমাসীন হলো।

এভাবে ইংরেজরা যা চাচ্ছিল তা পূর্ণ হলো। কাদিয়ানী এ লোকটি চমৎকারভাবে তার অভিনয় করে। ইংরেজরাও তার পৃষ্ঠপোষকতায় কোন ত্রুটি করেনি। অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সাথে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি এ কাজে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা তারা তাকে প্রদান করে।

গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও বৃটিশ সরকারপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা, তাদের একক ও ব্যাপক উপকারের কথা ভুলে যায়নি, বরঞ্চ এ কথা সে সব সময় স্বীকার করত, তার তথাকথিত যশ ও খ্যাতি একমাত্র বৃটিশ সরকারেরই অবদান।

তাই দেখা যায়, সে তার এক প্রবন্ধে নিজেকে বৃটিশ সরকারেই "স্ব-উৎপাদিত বৃক্ষ" হিসেবে পরিচয় দেয়।[১]

১. ১৮৯৮ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাবের গভর্নরের কাছে লিখিত "আবেদনপত্র"। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মীর কাশেম আলী লিখিত "তাবলীগ ও রেসালাত", ৭ম খণ্ড।

অন্য স্থানে নিজের নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও বিভিন্ন সেবামূলক কাজের ফিরিস্তি বর্ণনা করতে গিয়ে সে লেখে, "আমার জীবনের বৃহত্তম অংশ বৃটিশ সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতায় ব্যয়িত হয়েছে। আমি জিহাদের বিরুদ্ধে ও ইংরেজদের আনুগত্যের পক্ষে এত বেশী বইপত্র লিখি এবং ইশতেহার প্রচার করি, যদি সেগুলো একত্র করা হয়, তাহলে পঞ্চাশটি আলমারী তা দ্বারা পূর্ণ করা যাবে। এ বইগুলো আমি সমস্ত আরব দেশ, মিসর, সিরিয়া, কাবুল ও রোম পর্যন্ত পৌঁছে দেই।"[১]

অন্য এক স্থানে সে লেখে–

"জীবনের প্রারম্ভকাল থেকে আজ প্রায় ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত আমার কলম ও রসনাকে আমি নিয়োজিত রেখেছি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে। সেটা হচ্ছে, বৃটিশ সরকারের প্রতি সহানুভূতি, শুভেচ্ছা ও সত্যিকারের ভালবাসা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের অন্তরে পরিবর্তন সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে কম মেধাসম্পন্ন লোকদের হৃদয় থেকে জিহাদের চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করা, যা তাদেরকে আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম সম্পর্কের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।"[২]

উক্ত বইতেই একটু পরে সে লেখে ঃ

"আমি বিশ্বাস করি, আমার অনুসারীদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই জিহাদী চেতনায় বিশ্বাসীদের সংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। কেননা আমাকে 'মসীহ' ও 'মাহদী' হিসেবে গ্রহণ করা মানেই জিহাদী উদ্দীপনাকে প্রত্যাখ্যান করা।"[৩]

অন্য এক স্থানে সে বলে ঃ

আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে আমি প্রচুর বই এ উদ্দেশ্যেই লিখেছি, এ সদাশয় (বৃটিশ) সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কোনক্রমেই জায়েয নেই, বরং সর্বান্তকরণে তাদের আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলমানদের ওপর ফরয।

সুতরাং বহু অর্থ ব্যয় করে বইগুলো প্রকাশ করে ইসলামী দেশসমূহে পৌঁছে দেই। আমি জানি, এদেশেও (ভারতে) বইগুলোর অনেক প্রভাব পড়েছে। আমার সাথে যাদের মুরীদ হওয়ার সম্পর্ক রয়েছে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এমন একটি দলে পরিণত হয়েছে, যাদের অন্তরে (বৃটিশ) সরকারের অনুপম আন্তরিকতার আলোকে উদ্ভাসিত। তাদের চারিত্রিক অবস্থা অনেক উর্ধ্বে। আমি মনে করি, তারা সবাই দেশের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ এবং সরকারের জন্য উৎসর্গীকৃতপ্রাণ।"[৪]

১. মীর্জা কাদিয়ানী লিখিত "তিরয়াকুল কুলুব", পৃষ্ঠা ১৫।

২. মীর্জা কাদিয়ানী রচিত "শাহাদাতুল কোরআন"- এর সংযোজন অধ্যায়, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১০।

৩. প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৭।

৪. তাবলীগ-ই রিসালাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫, মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর পক্ষ হতে মহিমান্বিত বৃটিশ সরকারের প্রতি বিনীত আবেদন।

মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর এ আন্দোলন বৃটিশ সরকারের জন্য অনেক নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা, বিশ্বস্ত বন্ধু ও আত্মউৎসর্গকারী এজেন্টের জন্ম দিয়েছে। এ দলের বাছাই করা কিছু লোক ভারতের ভেতরে ও বাইরে ইংরেজ সরকারের বহু গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দেয় এবং এজন্য তারা জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি।

যেমন, আব্দুল লতীফ কাদিয়ানী। সে আফগানিস্তানে কাদিয়ানী মতবাদের প্রচার ও জিহাদের বিরোধিতা করে আসছিল। আফগান সরকার তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। কারণ তার প্রচারণার কারণে এ আশঙ্কা দেখা দেয়, জিহাদী প্রেরণা ও যুদ্ধোৎসাহী হিসেবে বিশ্ব জুড়ে আফগান জাতির যে সুপরিচিতি ও খ্যাতি রয়েছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এভাবে মোল্লা আব্দুল হালীম কাদিয়ানী ও মোল্লা নূর আলী কাদিয়ানীও ইংরেজ সরকারের স্বার্থেই আফগানিস্তানে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

কেননা আফগান সরকার তাদের কাছ থেকে এমন কতগুলো চিঠি ও কাগজপত্র উদ্ধার করে, যাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, তারা বৃটিশ সরকারের এজেন্ট ছিল এবং আফগান সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। ১৯২৫ সালে আফগানিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতিতে এ তথ্য প্রকাশ করেন এবং কাদিয়ানীদের নিজস্ব মুখপত্র "আল ফযল" ১৯২৫ সালের ৩রা মার্চ সংখ্যায় এ প্রতিবেদন প্রচার করে এবং প্রাণ বিসর্জনের জন্য তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

তারই ভিত্তিতে এই কাদিয়ানীগোষ্ঠী তার যাত্রালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সর্বদা সর্বপ্রকার জাতীয়তাবাদী বা দেশীয় আন্দোলন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে। মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর জীবদ্দশায় যেমন তারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেনি, তেমনি তার মৃত্যুর পরও তারা ঝাঁপিয়ে পড়েনি স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামে।

শুধু তাই নয়, ইংরেজদের মোড়লীপনার ছত্রছায়ায় ইউরোপীয় তল্পীবাহকদের হাতে মুসলিম বিশ্বের ওপর অত্যাচারের যে স্টিমরোলার চালানো হচ্ছিল, তা তাদেরকে শোকের পরিবর্তে আনন্দ দিয়েছিল। সাধারণ ব্যবস্থা, ইসলামী বিষয়াদি অথবা রাজনৈতিক অনুভূতি ও ইসলামী প্রেরণার প্রতিফল হিসেবে সৃষ্ট আন্দোলন- এসব ব্যাপারে কখনও তাদের মাথা ব্যথা ছিল না। ধর্মীয় বাদানুবাদ ও খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টিই ছিল তাদের কাজ।

মসীহ'র মৃত্যু, মসীহ'র জীবন, মসীহ'র অবতরণ ও মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর নবুওয়াতের ওপর বিতর্কানুষ্ঠান পর্যন্ত তাদের উৎসাহ সীমাবদ্ধ ছিল।

ভারতের উলামায়ে কেরাম ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ এই কাদিয়ানী ফিত্‌নাকে আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখলেন। তাঁরা নিজেদের বক্তৃতা, লেখনী ও জ্ঞানের অস্ত্র দ্বারা এ ফিত্‌নার মূলোৎপাটনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

আর এটা স্পষ্ট, এমন এক রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন সরকার যে নিজেই এই ফিত্‌নার উদ্ভাবক ও পৃষ্ঠপোষক, তার যুগে তেমন বড় ধরনের কোন ঘটনাক্রমে নেয়া সম্ভব ছিল না। ইসলামী মুজাহিদদের মধ্যে চারজনের নাম শীর্ষে। তাঁরা হলেন মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী (র.), মাওলানা মুহাম্মদ আলী মুঙ্গেরী (র.), লক্ষ্ণৌস্থ নদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সানাউল্লাহ অমৃতসরী (র.), মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (র.), শায়খুল হাদীস, দারুল উলুম দেওবন্দ।

ইসলামী দলগুলোর মধ্য হতে সবচেয়ে বেশী উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে যে দলটি এ বিদ্রোহী গ্রুপের বিরুদ্ধে তৎপর ছিল, সে দলটির নাম হচ্ছে "মজলিসে আহরারে ইসলাম"।

দলটির সভাপতি ও প্রাণ ছিলেন মাওলানা সাইয়েদ আতাউল্লাহ শাহ্ বোখারী (র.)। ইসলামের গর্ব মহান চিন্তাবিদ আল্লামা ড. মোহাম্মদ ইকবালও তাঁদের সাথে ছিলেন। বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, "কাদিয়ানী মতবাদ নবুওয়তে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আল্লায়হি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ, ইসলামের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র এবং একটি স্বতন্ত্র ধর্ম-বিশ্বাস। তার অনুসারীরা ভিন্ন একটি সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায় কখনও মহান ইসলামী উম্মাহর অংশ নয়।"

এটা সর্বজনবিদিত, ড. ইকবাল গোঁড়াপন্থী মৌলভী ছিলেন না। তিনি মুসলিম বিশ্বের অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত ও স্বাধীনচেতা বুদ্ধিজীবীদের একজন এবং মুসলিম ঐক্যের প্রবল আবেগপ্রবণতায় বিশ্বাসীদের প্রথম সারির ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষপাতহীনতা, সহিষ্ণুতা ও উদারতা হচ্ছে এ ঐক্যের মূলনীতি। কিন্তু যেহেতু ড. ইকবাল মীর্জা গোলাম আহমদের অতি নিকটে অবস্থান করে তাকে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং তার ধর্মীয় অভিসন্ধি ও রহস্য সম্পর্কে ওয়াফিকহাল ছিলেন, এজন্য তিনিও এ ফিত্‌নার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তিনিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি কাদিয়ানীদেরকে মুসলমানদের থেকে আলাদা অমুসলিম সংখ্যালঘু একটি জাতি হিসেবে ঘোষণা দেয়ার দাবী উত্থাপন করেন।

উল্লেখ্য, কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও আল্লামা ইকবাল দু'জন পাঞ্জাবের অধিবাসী। এখানে আমরা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বক্তৃতাসমূহ হতে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

ভারতের বিখ্যাত ইংরেজী সংবাদপত্র 'দি স্টেটস্‌ম্যান' একবার এ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। আল্লামা ইকবাল তাতে একটি প্রতিবেদন পাঠান। তাতে তিনি লেখেন, "কাদিয়ানী মতবাদ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতের সমান্তরাল একটি আলাদা নবুওয়াতের ভিত্তিতে একটি নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশে নিয়মতান্ত্রিক তৎপরতার নাম।"[১]

সে সময়েই ভারতের প্রখ্যাত নেতা, সাবেক প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এ প্রশ্ন তোলেন, মুসলমানগণ কেন কাদিয়ানীদেরকে ইসলাম থেকে আলাদা করে অমুসলিম ঘোষণার জোর দাবী জানাচ্ছে? অথচ কাদিয়ানীরাও মুসলমানদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত একটি সম্প্রদায়!

ভারতের দেশপূজক নেতা সাধারণভাবে কাদিয়ানী মতবাদকে পছন্দ করত। কেননা এ মতবাদ প্রসারিত হলে ভারতের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে এবং মুসলমানগণ তাদের কেবলা ও আত্মশুদ্ধির কেন্দ্র হেজাযের পরিবর্তে ভারতকে বানিয়ে নেবে। ঐ নেতাদের ধারণানুযায়ী এর প্রেক্ষিতে মুসলমানদের হৃদয়ে দেশপূজার ভিত অনেক দৃঢ় হবে।

যে সময় পাকিস্তানে কাদয়ানীবিরোধী আন্দোলন চলছিল, তখন ভারতের কিছু কিছু পত্রিকা কাদিয়ানীদের সমর্থনে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে। তাদের পাঠকদেরকে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাদিয়ানীদের সমর্থক ও তাদের সহযাত্রী বানানোর চেষ্টা চালায়।

এমন কি শেষ পর্যন্ত তারা এও লেখে, পাকিস্তানের কাদিয়ানী ও মুসলমানদের এই দ্বন্দ্ব মূলত আরবী ও হিন্দী নবুওয়াতের দ্বন্দ্ব এবং দুই প্রতিদ্বন্দ্বী নবুওয়তের অনুসারীদের দ্বন্দ্ব।

তখন আল্লামা ইকবালই এর উত্তরে বলেন, "আমরা বিষয়টির ওপর এজন্য চাপ প্রয়োগ করছি, কাদিয়ানী আন্দোলন নবী আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত থেকে হিন্দী নবীর উম্মত করার প্রয়াসে লিপ্ত।" তিনি আরও বলেন, "ইয়াহুদী জীবন ব্যবস্থার প্রতি তাদেরই একজন বিদ্রোহী দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza)-এর আক্বীদা-বিশ্বাস যত মারাত্মক হতে পারে, ভারতে ইসলামী সামাজিক জীবন ব্যবস্থার প্রতি এ কাদিয়ানী আন্দোলন তার চেয়েও বেশী মারাত্মক।"

আল্লাহ্ পাক খতমে নবুওয়তের আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য ড. ইকবালের হৃদয়কে প্রসারিত করেছিলেন।

১. দি স্টেটসম্যান, ১০ই জুন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ।

তিনি সুগভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, একমাত্র এই আক্বীদাই ইসলামের সামাজিক জীবন ব্যবস্থা, উম্মতের সংহতি ও শৃঙ্খলার চাবিকাঠি। এ আক্বীদার বিরুদ্ধে চক্রান্ত, বিদ্রোহ কোন অবস্থাতেই শিথিল দৃষ্টিতে দেখার যোগ্য নয়। কেননা এ বিদ্রোহ ইসলামী প্রাসাদের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাতের নামান্তর।

পূর্বে দি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকাতে প্রেরিত যে প্রতিবেদনের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে তিনি লেখেন, "হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী"-এর আক্বীদা-বিশ্বাসই হচ্ছে একক উপাদান, যা ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মাঝে স্থায়ী সীমারেখা (Line of Demarcation) টেনে দেয়।

তারা মুসলমানদের সাথে তাওহীদের ব্যাপারে এই আক্বীদা পোষণ করে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়াতকেও স্বীকার করে। কিন্তু ওহী ও নবুওয়তের পরম্পর বা সিলসিলার সমাপ্তি স্বীকার করে না। যেমন, ভারতে ব্রাহ্ম সমাজ। তখন এ আক্বীদাই হচ্ছে একমাত্র মাপকাঠি যার আলোকে কোন্ দল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত অথবা বহির্ভূত তা নির্ণয় করা যেতে পারে।

আমি ইতিহাসে মুসলমানদের এমন কোন দলের নাম জানি না, যারা এই সীমারেখা অতিক্রম করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। ইরানের একটি গোষ্ঠী 'বাহাইয়্যাহ' খতমে নবুওয়তের আক্বীদাকে অস্বীকার করে বটে, কিন্তু তারা একথাও স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়, তারা একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় যে সম্প্রদায় সাধারণতভাবে প্রচলিত অর্থে মুসলমান নয়।

আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি, ইসলাম আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত দ্বীন বা ধর্ম। কিন্তু একটি সোসাইটি হিসেবে অথবা একটি জাতি হিসেবে এর অস্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। সুতরাং কাদিয়ানীদের সামনে দু'টি পথ রয়েছে।

হয় তারা বাহাইয়াদের অনুসরণে নিজেদেরকে মুসলিম মিল্লাত থেকে আলাদা করে নেবে নতুবা খতমে নবুওয়াতের বিকৃত ব্যাখ্যার ভাষ্য হতে বিরত থাকবে।

অন্যথায় তাদের এ ধরনের রাজনৈতিক অপব্যাখ্যা তাদের মনে লুক্কায়িত মতলবের প্রতিই ইঙ্গিত করে, এরা কেবল সেই সকল সুবিধার লোভে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত থাকতে চায়, যে সুযোগগুলো শুধু মুসলমান নামের সাথে সম্পর্কিত। কেননা এছাড়া ঐ সুবিধাদি ও স্বার্থের কোন অংশই তারা পাবে না।

তিনি অন্য এক জায়গায় লেখেন ঃ

"কোন দল যারা সর্বজনবিদিত ও সাধারণভাবে পরিচিত ইসলাম হতে বের হয়ে যায় এবং সে দলের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও মন-মেযাজ এক নতুন নবুওয়তের

অস্বীকারকারী মুসলমানদেরকে কাফের বলে, সে দল ইসলামের নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। সব সময়ই তাদের ওপর মুসলমানের কড়া দৃষ্টি রাখা উচিত।

ইসলামী সামাজিকতার ঐক্য একমাত্র খতমে নবুওয়তের আক্বীদার ওপর সীমাবদ্ধ।"

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তাধারাসম্পন্ন আল্লামা ইকবালের মত মহান ব্যক্তির ছিল এই ভূমিকা।

কিন্তু সময় এগিয়ে চলল। কাদিয়ানীরাও নিজেদের নিয়োজিত রাখল বিসংবাদ, অরাজকতা সৃষ্টিতে, বিতর্কানুষ্ঠানে, অবিশ্বাস ও সংশয়ের বীজ বপনে, অনিষ্ট চিন্তায় ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেবায়।

তাদের সদর দফতর ছিল ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান গ্রামে। বৃটিশের নিরাপত্তামূলক ছত্রছায়ায় তারা তাদের দুরভিসন্ধিপূর্ণ তৎপরতা চালিয়ে যেতে লাগল।

কিন্তু কখনো তারা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি যে, কোন এক সময় বড় ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের করায়ত্ত হবে এবং এমন কোন তৈরী রাষ্ট্র তাদের কর্তৃত্বে এসে যাবে যার নিরংকুশ ক্ষমতা অর্জিত হবে। কারণ প্রথমত তারা রাষ্ট্রের জন্য রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। দ্বিতীয়ত, তাদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য এবং তারা মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় চাপা পড়ে ছিল।

কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলো এবং কাদিয়ানীরা, নিজেদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যা কল্পনাও করতে পারত না, একবিন্দু রক্তপাত ছাড়াই তা পেয়ে গেল অর্থাৎ রাষ্ট্র ও ক্ষমতার ওপর ঐ প্রভাব-প্রতিপত্তি তাদের পাকিস্তান নামের নতুন রাষ্ট্রে অর্জিত হয়েছিল। মীর্জা গোলাম আহমদ ও তার সাথীরা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দিল, মুসলমানদের যারাই এ নতুন ধর্মে বিশ্বাস করে না, তারা কাফের। তাদের পেছনে নামায পড়া জায়েয হবে না। তাদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া জায়েয হবে না।

মোটকথা, তাদের সাথে কাফেরদের মত ব্যবহার করা উচিত। মীর্জা গোলাম আহমদের পুত্র মীর্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ তার গ্রন্থ "আয়নায়ে সাদাকাত"-এ লেখে ঃ

সমস্ত মুসলমান যারা প্রতিশ্রুত মসীহ'র হাতে বায়আতে অংশ নেয়নি, যদিও তারা প্রতিশ্রুত মসীহ'র নাম না শুনে থাকে, তবু তারা কাফের এবং ইসলামের গণ্ডিবহির্ভূত।[১]

১. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৫।

মীর্জা বশীরুদ্দীন আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলে ঃ যেহেতু আমরা মীর্জা গোলাম আহমদকে নবী মানি এবং আহমদীরা তাকে নবী মানে না, সুতরাং কুরআনে কারীমের শিক্ষা অনুযায়ী যে কোন একজন নবীর অস্বীকার কুফরীর আলোকে অআহমদীগণ কাফের।[১]

সে এক বক্তৃতায় মুসলমান ও কাদিয়ানীদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে মীর্জা আহমদের এ উক্তিটি বর্ণনা করেঃ

"আল্লাহ তাআলার সত্তা, রাসূলে কারীম (সা.), কুরআন, নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত অর্থাৎ প্রতিটি বিষয়েই তাদের সাথে আমাদের মতপার্থক্য আছে।"[২]

পক্ষপাতিত্বের সীমা এত দূর গড়ায় যে, যখন পাকিস্তানের জনক কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র ইন্তেকাল হয়, তখন নিজস্ব আক্বীদার কারণে জাফরুল্লাহ খান তাঁর নামাযে জানাযায় অংশ গ্রহণ করেনি। এ ছিল সে সমস্ত কারণ, যা মুসলিম নেতৃবৃন্দকে আকণ্ঠ ভাবিয়ে তুলেছিল। তারা দেখলেন, ইসলামী প্রাসাদের অভ্যন্তর ঘুণে ছেয়ে যাচ্ছে এবং এটা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَايَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ط وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ج قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ج وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনের কোন ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেক গুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।" (সূরা আল ইমরান-১১৮)-এর সরাসরি বিরোধী। তখন তারা বললেনঃ এ সংকট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ হলো কাদিয়ানীদেরকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিষ্কৃত এবং অমুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবে চিহ্নিত করা। এটা হুবহু ঐ দা'বীই ছিল যেটা সর্বপ্রথম ড. ইকবাল উত্থাপন করেন এবং তিনি তাঁর লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে অত্যন্ত কঠোর দৃঢ়তার সাথে এরই প্রতি আহ্বান জানাতে থাকেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন,

১. আল-ফযল, ২৬ ও ২৯ শে জুন, ১৯২২ ইং, ২. আল ফযল, ৩০ শে জুন, ১৯৩১।

"শিখরা হিন্দুদের প্রতি যত না বিদ্বেষী, কাদিয়ানী মতবাদ ইসলামের প্রতি তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশী বিদ্বেষী। কিন্তু বৃটিশ সরকার শিখদেরকে অহিন্দু সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে, অথচ তাদের উভয়ের মাঝে অসংখ্য সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধন বিদ্যমান। তারা পারস্পরিক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে, অথচ কাদিয়ানী মতবাদ মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের নিকট মেয়ে বিয়ে দেয়া কাদিয়ানীদের জন্য হারাম করা হয়েছে।"

তাদের প্রতিষ্ঠাতা মুসলমানদের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ককে এ বলে নাজায়েয ঘোষণা দিয়েছে, "মুসলমানদের উদাহরণ হচ্ছে নষ্ট দুধের মত, অথচ আমরা হলাম তাজা দুধের মত।"

আফসোস! ইসলামী বিশ্ব এখন পর্যন্ত কাদিয়ানী মতবাদের ভয়াবহ বিপদ সম্পর্কে সচেতন নয়। ইসলামী জগতে আজ কাদিয়ানী মতবাদ কেবল একটি ধর্মমত অথবা ধর্মীয় গোষ্ঠীর নাম নয়, বরং মুসলমানদের জাতীয় সংহতিকে দরহম-বরহম বা তছনছ করে দেয়ার একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) কর্তৃক আনীত ইসলামের বিরুদ্ধে এক ভয়াল বিদ্রোহ। কাদিয়ানী মতবাদ ইসলামবিদ্বেষী এবং সর্বাবস্থায় ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বী।

কাদিয়ানী মতবাদ চায় আক্বীদা-বিশ্বাস, চিন্তা-গবেষণা, অনুভূতি ও উৎসাহ-উদ্দীপনার দিগন্তে ইসলামের যে অবস্থান, তা সে পাক। আদম সন্তানের আনুগত্য, ভালবাসা, শ্রদ্ধা-ভক্তির যে বিপুল অংশ ইসলাম লাভ করেছে, তা তার দিকে ঘুরে যাক!

কাদিয়ানী মতবাদ পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করে, মীর্জা আহমদ শুধু সাহাবায়ে কেরাম, মুসলিম মিল্লাতের শ্রদ্ধাভাজন আউলিয়া, পীর-মাশায়েখ, মুজাদ্দিদ ও ওলামায়ে কেরামের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় জনই নয়, বরং অনেক মহান আম্বিয়া ও রাসূল (আলা নাবিয়্যীনা ওয়া আলাইহিমুস্ সালাম) অপেক্ষা বেশী মর্যাদাশীল ও পবিত্র। কাদিয়ানী মতবাদের দৃষ্টিতে পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মহান সাহাবায়ে কেরাম ও মীর্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর শিষ্যদের মাঝে কোন তফাৎ নেই।

মীর্জা গোলাম আহমদের পদমর্যাদা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুরূপ, বরং এর চেয়েও অনেক বেশী। তার খলীফারা খোলাফায়ে রাশেদীনের সমকক্ষ!

তাদের শহর 'কাদিয়ান' মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে মক্কা মোয়াযযমা ও মাদীনাতুর রাসূলের সমপর্যায়ের। কাদিয়ানের হজ্জ মক্কা মোয়াজ্জমার হজ্জ হতে কোন অংশে কম নয়।

তাদের দ্বিতীয় খলীফা মীর্জা বশীরুদ্দীন মীর্জা গোলাম আহমদ সম্পর্কে লেখেন ঃ

"তিনি আল্লাহ্র প্রেরিত অনেক নবীকেও ছাড়িয়ে গেছেন।"[১]

তিনি অনেক আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম হতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হতে পারে, তিনি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।[২]

মীর্জার শিষ্যদেরকে নবী করীম (সা.)-এর সাহাবী (রা.)-গণের সমকক্ষ ঘোষণা করে লেখে, "অতএব, এ দু'দলের মাঝে পার্থক্য করা বা এক দলকে অন্য দল থেকে সার্বিকভাবে শ্রেষ্ঠ বলা ঠিক নয়। এ দু'টি দল আসলে একটিই। উভয়ের মাঝে পার্থক্য শুধু সময়ের। তাঁরা হচ্ছেন প্রথম আবির্ভূত নবীর শিক্ষাপ্রাপ্ত। আর এরা হলো দ্বিতীয় আবির্ভূত নবীর।"[৩]

প্রতিশ্রুত মসীহ মুহাম্মদ ও হুবহু মুহাম্মদ।

'আন্ওয়ারে খিলাফত' নামক গ্রন্থে কাদিয়ানীদের খলীফা মীর্জা মাহমুদ আহমদ লেখে, "এবং আমার ঈমান, এ আয়াত 'ইসমুহু আহামাদ' দ্বারা প্রতিশ্রুত মসীহকেই বোঝানো হয়েছে।"[৪]

কাদিয়ানী মতবাদ শুধু এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সাইয়েদুল আউয়ালীন ওয়াল আখিরীন হযরত মুহাম্মদ (সা.) হতেও তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে।

মীর্জা গোলাম আহমদ তার বইতে বলে, "আমাদের নবী করীম (সা.)-এর রূহানিয়াত পঞ্চম শতাব্দীতে সংক্ষিপ্ত গুণাবলীসহ আবির্ভূত হয়। সে যুগ রূহানিয়াতের উৎকর্ষের শেষ যুগ ছিল না, বরং তার পূর্ণতা প্রাপ্তির ক্রমবিকাশের প্রথম পদক্ষেপ ছিল। অতঃপর রূহানিয়াত (আধ্যাত্মিকতা) ষষ্ঠ শতাব্দী অর্থাৎ এ যুগে (গোলাম আহমদের যুগ) পুরোপুরি বিকশিত হয়।[৫]

সে আরো বলে ঃ লাহু খাসাফুল কামারিল মুনীরে ওয়া ইন্নালী-গাযযাল কামারানিল মাশরিকানে আতুনকিরু।

অর্থাৎ তার [নবী করীম (সা.)] জন্য শুধু চন্দ্রগ্রহণের প্রমাণ প্রকাশিত হয়েছিল আর আমার জন্য প্রকাশিত হয়েছে চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের (গ্রহণের) প্রমাণ। এখনও কি তুমি অস্বীকার করবে?[৬]

কাদিয়ানী মতবাদের দৃষ্টিতে মীর্জা আহমদের কবরও জনাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর রওযা মোবারকের মতই মর্যাদাসম্পন্ন।

---

১. হাকীকাতুন নবুওয়ত, পৃষ্ঠা ২৫৭। ২. প্রাগুক্ত, ১৪তম খণ্ড, ২৯শে এপ্রিল,, ১৯২৭ সংখ্যা।
৩. প্রাগুক্ত, এ পত্রিকাটিই তার ৫ম খণ্ডে ২৮ শে মে, ১৯১৮ সালে প্রকাশিত।
৪. প্রাগুক্ত, ৩য় খণ্ডে ৫৫তম সংখ্যা। ৫. "খোতবায়ে এলহামিয়া" পৃষ্ঠা ১৭৭। ৬. এজাযে আহমদী, পৃষ্ঠা ৭১।

উদাহরণস্বরূপ কাদিয়ানীদের প্রশিক্ষণ বিভাগ থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'আল-ফযল'-এর একটি নিবন্ধের উল্লেখ করা যেতে পারে। নিবন্ধে বলা হয় ঃ এ পরিপ্রেক্ষিতে মদীনা মুনাওয়ারার সবুজ গম্বুজের পূর্ণ রশ্মি শ্বেত গম্বুজের ওপর প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। যে কেউ বিশ্বনবীর (সা.) রওযা মোবারক যিয়ারতের দোয়া এখানে হাসিল করতে পারেন। কতই না দুর্ভাগা সে ব্যক্তি, যে আহমদিয়াতের হজ্জে আকবরের এ পুণ্য হতে বঞ্চিত হলো!"[১] এভাবে কাদিয়ানীরা এ বিশ্বাসও পোষণ করে, তাদের কাদিয়ান শহরটি ইসলামের তিনটি পবিত্রতম স্থানের একটি।

কাদিয়ানীদের খলীফা মীর্জা মাহমুদ আহমদ লেখে ঃ আল্লাহ পাক এ তিনটি স্থানকে (মক্কা, মদীনা ও কাদিয়ান) সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর নূরের বহিঃপ্রকাশের (তাজাল্লী) জন্য নির্বাচিত করেছেন।"[২] অতঃপর কাদিয়ানী মতবাদ আরো এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বালাদে হারাম (সম্মানিত শহর বা মক্কা) ও মাসজিদে আক্সা সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতকে কাদিয়ান শহরের সাথে সম্পৃক্ত করে। মীর্জা গোলাম আহমদের বক্তব্য হচ্ছে, "ওয়ামান দাখালাহু কানা আমিনান" (এবং যে কেউ এতে প্রবেশ করবে শান্তিতে থাকবে) কুরআনের এ আয়াত তার মসজিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় বলা হয়েছে।[৩]

যমীনে কাদিয়ান আব মুহতারাম হ্যায়
হুজমে খালকছে আরযে হারাম হ্যায়

অর্থাৎ কাদিয়ানের ভূমি এখন অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ জায়গা। এটা জনগণের ভীড়ের কারণে হারাম শরীফের (মক্কা শরীফ) মতো পবিত্র।

সুবহানাল্লাযী আসরা ...

অর্থাৎ তিনিই সেই মহিমান্বিত সত্তা যিনি তাঁর প্রিয়তম বান্দাকে রাতের বেলা নৈশ পরিভ্রমণে নিয়ে গেলেন অতি পবিত্র মসজিদ (মক্কা) থেকে দূরবর্তী মসজিদে (বাইতুল মোকাদ্দাস, জেরুজালেম) যার চারদিক আমার রহমতে পরিপূর্ণ। এই আয়াতে উল্লিখিত 'মাসজিদে আক্সা' দ্বারা কাদিয়ানের মসজিদকেই বোঝানো হয়েছে।[৪]

১. আল ফযল, দশম খণ্ড, ৪৮তম সংখ্যা, ১৮ ই ডিসেম্বর, ১৯২২।
২. আল-ফযল, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৫।
৩. "বারাহীনে আহমদিয়্যাহ'র টীকার সংক্ষিপ্ত, পৃষ্ঠা ৫৫৮ দূররে ছামীন, ৫২ পৃষ্ঠায় বলা হয়।
৪. প্রাগুক্ত, ২০তম খণ্ড, ২১ শে আগস্ট, ১৯৩২ সংখ্যা।

যখন আয়াতের অর্থ এই দাঁড়াল, কাদিয়ান শহর আল্লাহর পবিত্র শহরের সমকক্ষ, বরং তার চেয়ে কিছু বেশী, তখন অবশ্যই তার উদ্দেশ্যে সফর করা হজ্জ সমতুল্য হবে অথবা তার চেয়ে কিছু বেশী মর্যাদাশীল হবে। সুতরাং মীর্জা মাহমুদ আহমদ জুমার খুতবায় বলে, "এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা আরেকটি যিল্লী (ছায়া) হজ্জের অনুমোদন করেছেন যাতে তিনি যে জাতিকে দিয়ে ইসলামের উন্নতির কাজ নিতে চান... এবং ভারতের দরিদ্র মুসলমানরা এতে অংশ নিতে পারে।"[১]

কাদিয়ানী মতবাদের অন্য এক নেতৃস্থানীয় লোক আরেকটু আগে বেড়ে বলে ঃ যেভাবে আহমদী মতবাদ অর্থাৎ হযরত মীর্জা সাহেবকে বাদ দিলে ইসলামের যেটুকু বাকি থাকে, তা হচ্ছে শুষ্ক ইসলাম। অনুরূপভাবে এ ছায়া হজ্জ ছাড়া মক্কার হজ্জও শুষ্ক থেকে যায়, যেহেতু আজকাল মক্কার হজ্জের উদ্দেশ্য আর পূর্ণ হচ্ছে না।"[২]

তাদের এ ধরনের বক্তব্যে আন্দাজ করুন, কাদিয়ানী মতবাদ আন্তর্জাতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ধর্মে পরিণত হওয়ার জন্য কেমন তৎপর ও আশান্বিত!

তাদের নিজস্ব একজন নবী হবে। সাহাবা ও খলীফা হবে। পবিত্র স্থান থাকবে। তার নিজস্ব ইতিহাস ও ব্যক্তিত্ব থাকবে। নিজস্ব সাহিত্য ও প্রচারপত্র থাকবে।

ইসলামের অমর ও চিরস্থায়ী উত্তরাধিকারিত্ব, ইসলামের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য, ইসলামের প্রথম ঝর্ণাধারা, উৎস, ইসলামের পবিত্র স্থান ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্রসমূহ (অর্থাৎ ইসলামের সাথে সম্পর্কিত সব কিছু) থেকে তারা স্বীয় অনুসারীদের সম্পর্ক ছিন্ন করে যে কোন উপায়েই হোক, উল্লিখিত প্রতিটি জিনিসের বিকল্প হিসেবে নতুন আরেকটি জিনিস তার অনুসারীদের জন্য সরবরাহ করছে। কিন্তু এ মহান বিষয়গুলোর বিকল্প কিভাবে হতে পারে? এসব হতে আল্লাহর পানা কামনা করছি।

আর এভাবেই কিছু লোক নবী আরাবী (সা.)-এর ভালবাসা ও তাঁর আনুগত্যের স্পৃহা, তাঁর স্মরণের আস্বাদন, তাঁর পবিত্র জীবনী অধ্যয়ন ও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ হতে পশ্চাৎগামী হয়ে কাদিয়ানী নবীর ভালবাসা, তার পবিত্রতা বর্ণনা, মহত্ত্ব ঘোষণা ও গুণকীর্তন, তার জীবনী অধ্যয়ন ও তার পদাঙ্ক অনুসরণ শুরু করে। এ লোকগুলো ইসলামের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস, ঈমান

১. আল-ফযল, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৩২।
২. পয়গামে সুলহ, লাহোর, ২১তম খণ্ড, ২২তম সংখ্যা।

ও বীরত্বের ইতিহাস এবং মানবিক মর্যাদাবোধের ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে এমন এক ইতিহাসের প্রতি আসক্ত হয়ে যায়, যা সুস্পষ্ট লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার ইতিহাস। অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী ও স্বৈরাচারী সরকারের হাতের ক্রীড়নকের ইতিহাস। জী হুজুরী, মোসাহেবী ও তোষামোদের ইতিহাস। গুপ্তচরবৃত্তি ও মুনাফেকীর ইতিহাস।

এ লোকগুলো ইসলামের সে সব মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁরা সত্যিকার অর্থে মানবতার গর্ব ও যাঁরা মানব জাতির নয়ন শীতলকারী, যাঁরা পাহাড়সম মর্যাদার অধিকারী ও ইতিহাসের অনন্ত ও ক্ষয়হীন আদর্শের বাহক, সে কীর্তিমান পুরুষদের থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এমন সব হীনমন্য, দুশ্চরিত্র ও নিকৃষ্ট স্বভাবের মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যারা গোলামীর ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষা জানে না, যারা অন্তর বিক্রির কাজ ছাড়া আর কোন কাজে আসে না।

এসব লোক জীবন্ত ও অনন্ত অক্ষয় ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এমন এক কুচক্রী, হীন ও নিস্তেজ অলস (Letarahore) প্রতি ঝুঁকে পড়ে, যার মধ্যে বজ্জাতি, অশ্লীল কথাবার্তা, বিশ্রী গালাগালি, স্ববিরোধী উক্তি, ডাহা মিথ্যা, লম্বা-চওড়া দাবী, হাস্যকর ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণীর ফাঁকা বুলি আওড়ানো ছাড়া আর কিছুই তারা জানে না যার কোনটাই বাস্তবায়িত হয়নি।

এসব লোক সেই পবিত্র শহর যেথায় ওহী নাযিল হয়েছে, যেখানে ফেরেশতাগণ অবতরণ করেছেন, যেখানে মানবতার বিদ্যাপীঠ রয়েছে, যা মানবতার আশ্রয়স্থল এবং যার আকাশ হতে এ ধরার সুবহে সাদিক উদিত হয়, সেই শহর হতে ভক্তির আত্মীয়তা ছিন্ন করে এমন এক শহরকে ভক্তি-শ্রদ্ধার কেন্দ্রে পরিণত করতে চায়, যা হলো গুপ্তচরবৃত্তির আস্তানা এবং মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে মুনাফেকী ও ষড়যন্ত্রের আড্ডাখানা।

এই হলো কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের স্বরূপ, যা প্রতিটি ভালকে মন্দে পরিণত করে।

কাদিয়ানী মতবাদ ইসলামী বিশ্ব-বদনের সেই পচা অংশ, যে অংশটি তার অভ্যন্তরীণ শিরা-উপশিরায় নির্লজ্জতা ও কাপুরুষতা, পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের মোসাহেবী ও চামচাগিরি এবং সে সব অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য ও দাসবৃত্তির বিষ ছড়াচ্ছে, যারা আল্লাহর যমীনকে অত্যাচার ও অরাজকতায় পূর্ণ করে রেখেছে এবং দুনিয়ার মুসলমানদেরকে তাদের গোলামীর পিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রেখেছে।

এ মতবাদ কালেমার ঐক্য বিধ্বস্ত করে দিয়ে ইসলামী বিশ্বকে চিন্তার ভারসাম্যহীনতায় নিক্ষেপ করে। ইসলামের আসল ঝর্ণাধারা, তার উৎস ও তার পরীক্ষিত মহান ব্যক্তিবর্গের বিশ্বস্ততাকে টলটলায়মান করে দেয়। জাতির

জাঁকজমকপূর্ণ অতীত ইতিহাস, তার গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলো ও মহান মর্যাদাশালী সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গ হতে জাতির সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার ও তাদের অনুসারীদের জন্য পথ পরিষ্কার করে দেয়। তারা ইসলামের অপরাজেয় ক্ষয়হীন শক্তি ও তার বাসন্তী জীবনধারা সম্পর্কে কুধারণার জন্ম দেয়। মুসলমানদেরকে তাদের ভবিষ্যত হতে নিরাশ করে দেয়।

কাদিয়ানী মতবাদ মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা, আন্তর্জাতিক সমস্যাদি ও ইনসাফভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তা থেকে দূরে সরিয়ে কিছু বাজে বিষয়ের মাঝে জড়িয়ে ফেলে এবং এই মহান জাতিকে সেই ইউরোপিয়ান জাতির গাড়ীর কুলিতে পরিণত করার হীন প্রচেষ্টা চালায়, যার ইঙ্গিতে এদের আবির্ভাব ঘটে আর যাদের স্বার্থ সংরক্ষণে এরা লালিত-পালিত। আফসোস! কাদিয়ানী মতবাদ মীর্জা গোলাম আহমদের মত মূল্যহীন মানুষের মাথায় নবুওয়তের মুকুট পরিয়ে মানবতাকে ততটুকু অধঃপতনের দিকে নিক্ষেপ করেছে, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সা.)-এর নবুওয়ত যতটুকু সমুন্নত করেছিল।

কাদিয়ানী মতবাদ গোটা মানবতাকে অবমাননা করেছে। মানব সভ্যতার ললাটে কলংকের দাগ এঁকে দিয়েছে। এজন্য এর অস্তিত্ব এমন একটি অন্যায়, যা কখনো ক্ষমা করা যায় না এবং এটা এমন এক ক্ষমাহীন অপরাধ, যা ইতিহাস বিস্মৃত হতে পারে না। কাদিয়ানী সমস্যা কোন একটি রাষ্ট্র বা সরকারের সমস্যা নয়। এটা পুরো মুসলিম বিশ্বের সমস্যা। এটা ইসলামী আক্বীদার প্রশ্ন। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইয্যতের প্রশ্ন। মানব সভ্যতার প্রশ্ন।

যদি এ মহান আক্বীদা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, যদি তার সম্মানে আঘাত করা হয়, যদি তার পবিত্রতাকে কলংকিত করা হয়, তাহলে তা হবে মাটির এ গোলাকার পৃথিবীর জন্য চরম অকল্যাণ।

এগুলো হচ্ছে প্রকৃত তথ্য। কিন্তু যারা সত্য হতে দূরে ও কল্পনার রাজ্যে বাস করতে আগ্রহী এবং সত্য সম্পর্কে নিজেদের ধোঁকায় বন্দী রাখতে চায়, তাদের জন্য ও যাদের দৃষ্টিতে ধর্ম ও আক্বীদার কোন মূল্য নেই এবং যারা দুনিয়াকে আখেরাতের ওপর প্রাধান্য দেয়, তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আমার কাছে কোন রসনা ও কলম নেই।

খতমে নবুওয়ত আল্লাহ তা'আলার পুরস্কার ও মুসলিম উম্মাহ'র বৈশিষ্ট্য

এই বিশ্বাস যে, দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, মুহাম্মাদুর (সা.) আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ পয়গম্বর ও খাতামুন্নাবিয়্যীন এবং ইসলাম আল্লাহতা'আলার সর্বশেষ পয়গাম ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ পুরস্কার এবং অনুগ্রহস্বরূপ যা আল্লাহ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মাদীর (সা.) জন্য নির্ধারিত করেছেন।

এজন্যই একজন ইয়াহুদী পণ্ডিত হযরত উমর (রা.)-এর সামনে এ বিষয়ে বড় ঈর্ষা ও দুঃখ প্রকাশ করে বললেন ঃ কুরআন শরীফে একটি আয়াত রয়েছে যা আপনারা পাঠ করে থাকেন। যদি সে আয়াতটি আমাদের ইয়াহুদীদের ধর্মগ্রন্থে অবতীর্ণ হতো এবং আমাদের সম্পর্কে হতো, তবে আমরা যেদিন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে, সেদিনকে জাতীয় আনন্দোৎসবের দিন হিসেবে পালন করতাম। তার উদ্দেশ্য ছিল, সূরায়ে মায়েদার এই আয়াতটি—

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম" (সূরা মায়েদা ঃ ৩) যাতে খতমে নবুওয়ত ও নেয়ামত-অবদান পরিপূর্ণ করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

হযরত উমর (রা.) এই নেয়ামতের মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও এই ঘোষণার গুরুত্বকে অস্বীকার করেন নি। তিনি শুধু এতটুকু বললেন ঃ আমাদের নতুন কোন আনন্দোৎসবের দিনের প্রয়োজন নেই। এ আয়াতটি এরূপ স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে, যা ইসলামের একটি মর্যাদাসম্পন্ন সম্মেলন (ইজতেমা) ও ইবাদাতের দিন।

এ স্থলে দুইটি ঈদ বা আনন্দোৎসব একত্র হয়েছিল। প্রথমটি হলো আরাফাতের দিন (৯ই যিলহজ্জ)। দ্বিতীয়টি জুমআর দিন।

মানসিক ভারসাম্যহীনতা থেকে হেফাযত

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ও মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যকে খণ্ড খণ্ড করে দেয়া এমন সব আন্দোলন ও দাওয়াতের শিকার হওয়া থেকে এই আক্বীদা বা বিশ্বাস ইসলামকে বাঁচিয়েছে যে সব আন্দোলন ইসলামের ইতিহাসে সুদীর্ঘ সময়ে ও ইসলামী বিশ্বের বিস্তৃত অঙ্গনে সময়ে সময়ে দানা বেঁধে উঠেছিল। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ও ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সৃষ্টি হওয়া নবুওয়তের মিথ্যা দাবীদার ও ইসলামের অপব্যাখ্যা দানকারীদের ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া থেকে কেবল এ বিশ্বাসের বদৌলতেই ইসলাম রক্ষা পেয়েছে।

খতমে নবুওয়তের এই দুর্গে এ জাতি ঐ দাবীদারদের আক্রমণ ও লুটতরাজ থেকে নিরাপদে ছিল, যারা ইসলামের মৌল কাঠামোকে পরিবর্তন করে নতুন কাঠামো তৈরি করতে চেয়েছিল। আর মুসলিম জাতি ঐ সকল ষড়যন্ত্র ও ভয়াবহ হামলাকে প্রতিহত করতে পেরেছে যা থেকে পূর্ববর্তী কোন নবীর উম্মত বাঁচতে পারেনি।

এ কারণেই দীর্ঘকাল ধরে উম্মতের ধর্মীয় ও বিশ্বাসগত ঐক্য ও একতার বন্ধন অটুট রয়েছে। যদি এ আক্বীদা-বিশ্বাস ও এ দুর্গ না থাকত, তাহলে একতাবদ্ধ এ জাতি এমন বহুধাবিভক্ত জাতিতে পরিণত হতো, যেখানে প্রতিটি উম্মতের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র (রূহানী মারকায) হতো আলাদা। একাডেমিগত ও সাংস্কৃতিক উৎসধারা হতো আলাদা। প্রতিটির ইতিহাস হতো আলাদা। প্রতিটির পূর্বসূরী ও ধর্মীয় নেতা ও রাহবার হতো আলাদা। ইতিহাস হতো আলাদা। প্রতিটির অতীত হতো আলাদা।

জীবন ও সংস্কৃতির ওপর খতমে নবুওয়তের এহ্‌সান

আক্বীদায়ে খতমে নবুওয়ত মূলত মানব জাতির জন্য একটি মর্যাদা, আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্য। এটি এ কথার ঘোষণা যে, মানব জাতি যৌবনে পদার্পণ করেছে এবং তার মাঝে এ যোগ্যতা সৃষ্টি হয়েছে যে, সে আল্লাহ্ তা'আলার আখেরী পয়গাম কবুল করতে পারবে।

এখন মানব সমাজের জন্য কোন নতুন ওহী, কোন নতুন আসমানী পয়গামের প্রয়োজন নেই। এ আক্বীদা দ্বারা মানুষের মাঝে আত্মবিশ্বাসের চেতনা পয়দা হয়েছে। তার এ কথাটি উপলব্ধ হয়, দ্বীন তার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে গেছে। এখন পৃথিবীর আর পেছনে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

এখন প্রয়োজন হলো এ পৃথিবীর নতুন ওহীর জন্য আসমানের দিকে দৃষ্টিপাতের পরিবর্তে আল্লাহ্প্রদত্ত শক্তি দ্বারা ফায়দা হাসিল করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নাযিলকৃত দ্বীন ও আখলাকের মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে জীবন গঠনের জন্য যমীনের দিকে ও নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করা।

আক্বীদায়ে খতমে নবুওয়ত মানুষকে পেছনের দিকে নেয়ার পরিবর্তে সামনের দিকে নিয়ে যায়। এই আক্বীদা-বিশ্বাস মানুষের মননে নিজের শক্তিকে ব্যয় করার প্রেরণা যোগায়। এ আক্বীদা মানুষকে তার চেষ্টা-প্রচেষ্টার বাস্তব ক্ষেত্র ও দিক বাতলে দেয়।

যদি খতমে নবুওয়তের আক্বীদা না থাকে, তাহলে মানুষ সর্বদা উৎকণ্ঠা ও আস্থাহীনতার জগতে বাস করবে। সর্বদা যমীনের দিকে তাকানোর পরিবর্তে আসমানের দিকে তাকাবে। সর্বদা সে নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে চিন্তাযুক্ত ও সংশয়-সন্দেহে থাকবে। বারেবারেই তাকে প্রত্যেক নতুন ব্যক্তি এসে এই বলবে, মানবতার পুষ্পকানন ও আদমের সবুজের সমারোহ এতদিন অসম্পূর্ণ ছিল। এখন তা ফুলে-ফলে, পত্র-পল্লবে পরিপূর্ণ হয়েছে। মীর্জার কবিতা ঃ

"রওযায়ে আদম কেহ থা উহ না মুকাম্মেল আব তাক
মেরে আনেছে হুয়া মুকাম্মাল বজুমলা বরগওয়ার।"